ভূমিকা

মা, সকলেই বলে আমার ঘড়ি ঠিক্। খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান — সকলে বলে, কেবল আমার ধর্ম ঠিক।

কিন্তু মা! আসল কথা, কারও ঘড়ি ঠিক নয়। কে তোমায় ঠিক ঠিক জানতে পারে? কিন্তু কেউ যদি ব্যাকুল হয়ে তোমায় ডাকে, তবেই তোমার কৃপায় তোমাকে জানতে পারে, তা যে কোন পথ দিয়েই হোক না কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। পাশে শ্রীম বসা। শিবমন্দিরের উত্তরের সোপানশ্রেণীতে বসিয়া — নিচে থেকে তৃতীয় সিঁড়িতে — উত্তর দিক হইতে আড়াই হাত দূরে। ঠাকুর এই স্থানেই সর্বদা বসিতেন।

মার্চ মাসের অপরার্ধের কোনও একদিন ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে, ১১ই মার্চের পর শ্রীম আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শন করিতে অপরাহ্ণ ৪।৫টার সময়। ইহা শ্রীম-র পঞ্চম দর্শন। তিনি প্রথম দর্শন করেন ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার। দ্বিতীয় দর্শন ২৮শে ফেব্রুয়ারী। সেই দিনই শ্রীম-র সহিত আন্তরিক কথাবার্তা হয়। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বুঝিতে পারেন শ্রীম ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় প্রভাবিত, নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে তাঁহার বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দর্শনের পূর্বে সাত আট বছর শ্রীম আচার্য কেশব সেনের গুণমুগ্ধ ছিলেন, এবং আদর্শ ভক্তাচার্যরূপে তাঁহারই উপদেশে জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি বলিতেন, কেশববাবুর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হতো, কখন দেখবো। এনট্রান্সের দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে এই অবস্থা হয়। ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এই আকর্ষণ। যেখানে তাঁর বক্তৃতা হত, তিন ঘন্টা পূর্বে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু ঠাকুরকে দর্শনাবধি বুঝতে পারলাম, তিনি আরও উচ্চ স্তরের লোক, চৈতন্যদেবের তুল্য। তাঁর কাছে বসলে মনে হতো, যেন ঈশ্বর আমার হাতের তলায়। দৈবী মানুষ কেশববাবুর বক্তৃতায় ঠাকুরের কথা ও ভাবের স্পর্শ থাকলেও, এবং

সেই জন্য তাতে আকর্ষণ হলেও, সেই বক্তৃতা শুনে মনে হতো, ঈশ্বর অতি দূরে, অতি উচ্চে।

কেশববাবুর বক্তৃতায় চৈতন্যদেবের উচ্চ প্রশংসা থাকিত বলিয়াই তাঁহার কাছে চৈতন্যসাহিত্যের সন্ধান পান শ্রীম — চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যলীলামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যমঙ্গল আদি প্রামাণিক গ্রন্থাবলীর। শ্রীম অতি সযতনে ঐ সব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ঠাকুরকে দর্শনের পূর্বে চৈতন্যদেবকে তাঁহার খুব ভাল লাগিত। তখনও শ্রীম জানিতেন না, চৈতন্যঅবতারে তিনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্য-অবতারে শ্রীম তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। এই কথা শ্রীমকে বলিয়াছিলেন শ্রীম-র সঙ্গে দেখা হইবার পর। বলিয়াছিলেন, বকুলতলায় চৈতন্যসংকীর্তন দেখেছিলাম এই চক্ষে। তাতে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। ইহার পর হইতে শ্রীম-র চৈতন্যপ্রীতি সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া যায়। আর আপনার দৈবী পরিচয় পাইয়া আত্মসম্মানও বহুদূর বর্ধিত হইয়া পড়ে। পরবর্তী সময়ে ঠাকুর নিজ মুখে শ্রীমকে এই কথা বলিয়াছিলেন — চৈতন্যদেব আর আমি এক।

শ্রীম সনাতনী ধর্মসংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দেবদ্বিজে প্রতিমায় তাঁহার ভক্তি স্বাভাবিক হইলেও কেশব সেনের ধর্মমতের প্রভাব শ্রীম-র উপর যথেষ্ট পড়ে।

কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের রঙে অনেকটা রাঙাইয়া যায়। অনেক কৃতবিদ্য লোক খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ঐ স্রোত বন্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি। এই ব্রাহ্মধর্ম তথা কেশব সেনের জীবনী ও বাণী ইয়ং বেঙ্গলকে খুবই আকর্ষণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের মাথার মণি নরেন্দ্রনাথ — স্বামী বিবেকানন্দও, ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বার হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার উপকণ্ঠে পাঁচ মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বর তপোবনে বসিয়া এই সব দেখিতেছিলেন — ধার্মিক ও সামাজিক পরিবর্তন হিন্দু সমাজের — ব্রিটিশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। আর তাঁহার সমরনীতি

প্রস্তুত করিতেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে অবিশ্বাসাসুরের জন্ম হয় ভারতে, বাংলায় সেই অসুর বধের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন — এই ধর্মযুদ্ধে কেশব সেনের সহায়তা প্রয়োজনীয়। বুঝিয়াছিলেন, জন দি ব্যাপটিস্টের মত কেশবচন্দ্র সেনও তাঁহার আগমনের পথ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কেশবকে ঠাকুর প্রথম দেখেন আদি সমাজে। কেশবের ধ্যানমূর্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই ছেলেটির ফাতনা ডুবেছে। বঁড়শীতে মাছ ধরলে যেমন ফাতনা ডোবে। তখন বয়স সাতাশ। দ্বিতীয়বার দেখেন ১৮৭২।৭৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। আর্য সমাজের আচার্য স্বামী দয়ানন্দ তখন ঠাকুরদের নৈনানের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। কেশব সেন সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই মিলনে উপস্থিত ছিলেন। কেশবকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হন। তৃতীয়বার দর্শন ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বেলঘরিয়ার জয়গোপাল সেনের বাগানে। কেশব সশিষ্য ঐ তপোবনে তপস্যানিরত ছিলেন। এই স্থানেই বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তার পরের পাঁচ ছয় বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সঙ্গে আপনার লোকের মত সম্পর্কিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রায় সকলেই কেশবের দলের নব্য শিক্ষিত ছোকরা। তাই তিনি অজ্ঞাতে কেশবের ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়া সেই শক্তিতে পরবর্তী কালের তাঁহার অন্তরঙ্গের সহিত একটা অজানা সম্পর্ক সংস্থাপন করেন। শ্রীম বলিতেন, যখন ঠাকুরকে দেখি, তখন মনে হতো কেন কেশববাবুকে এবং তাঁর কথাকে এত ভাল লাগতো। ঠাকুরের ভাব কেশবের ভিতর দিয়ে percolated (অনুস্রবণ করে) হয়ে আমাদের ভিতর স্পর্শ করে। কেশব বয়সে ঠাকুর থেকে ছয় সাত বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। কেশব দেহত্যাগ করেন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে। ঠাকুরের বয়স তখন ৪৮ বৎসর।

কেশবের বিদ্যা অধিক, তপস্যা অল্প। শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাই সর্বস্ব, বিদ্যায় প্রায় নিরক্ষর। কেশব তাঁহার চরিত্র, বাগ্মিতা, তপস্যা ও বিদ্যার সহায়তায় 'ইয়ং বেঙ্গলের' (নব্য যুবকগণের) হৃদয় দখল করেন। সেই ইয়ং বেঙ্গল পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা আত্মদর্শন করে, আর অবিশ্বাসাসুর

বধে আত্মসমর্পণ করে।

শ্রীম-র তৎকালের অবস্থায়, কেশব সেনের প্রচারিত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ হয়। আর ব্রাহ্মধর্মই গ্রহণীয় বলিয়া ধারণা হয়। ব্রাহ্মধর্ম ও দর্শন তৎকালীন হিন্দু ধর্ম হইতে উদার ছিল। তাই ইয়ং বেঙ্গল আকৃষ্ট হয় তাহাতে। শ্রীম-র ভিতর ঐ ভাব প্রবল হওয়ায়, শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সেই ভাব ক্ষালনের উপায়রূপে শ্রীম-র সম্মুখে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন শিবমন্দিরের সিঁড়িতে। আর জগদম্বা যে সাকার সগুণও, সেই বিশ্বাস প্রবিষ্ট করান শ্রীম-র হৃদয়ে, যুক্তি দিয়া নয় — জগদম্বাকে প্রায় দর্শন করাইয়া, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া শ্রীম-র সম্মুখে। শ্রীম বুঝিলেন সাকার সগুণও সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পণ্ডিতদের মত অধ্যয়নসংস্কৃত বিদ্যাবুদ্ধিপ্রসূত নহে, পরন্তু অপরোক্ষ অনুভব বা সাক্ষাৎ দর্শনমূলক। শ্রীমকে দ্বিতীয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর-দর্শন মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নিরাকার — আবার সাকার — আরও কত কি! তাঁহার ইয়ত্তা হয় না। তিনি নিরাকার নির্গুণ হইলেও ভক্তের জন্য সাকার সগুণ হন। আবার অবতার হইয়া থাকেন। কেবল দর্শনই দেন না — আবার কথা বলেন। শ্রীম-র বিশ্বাস সুদৃঢ় করিবার জন্য আজ নিজে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট স্নাতক শ্রীম যুক্তিবাদী। আজ ঠাকুর তাই তাঁহাকে যুক্তির উপরে প্রায় অর্ধ সাক্ষাৎকার করাইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ছেলের মত আব্দার করিলেন — মা, একবার চার্চের উপাসনা দেখাও। মা সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

শ্রীম বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেন ঈশ্বর সাকার-নিরাকার। আবার ঈশ্বর-দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বাসের মরণ দাগ এখনও পড়ে নাই। তাই আর এক ধাপ আগাইয়া দেখাইলেন, ঠাকুর ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন, আবার তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। শ্রীমকেও তাহা করিতে হইবে। Rationalist (যুক্তিবাদী) শ্রীম এখন work-shop-এ। কালে যে ইহার ফলস্বরূপ শ্রীম-র বুদ্ধি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় সম্যক্ মণ্ডিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ নিম্নে শ্রীম-র মুখের কথায় দিতেছে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীম এই

উপদেশ পাইয়াছিলেন। ঈশ্বর সাকার-নিরাকার। তিনি বহু নামে কথিত। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তিনি নিজের, তাঁহার দ্বারা গঠিত ভক্তমণ্ডলীকে বলিতেছেন, ঠাকুর আমাদের চোখে এই একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন — 'যত মত তত পথ'। তাই সব মতকে ভাল লাগে। সব মানুষই আত্মীয় বলে বোধ হয়। তাই তো তিনি নিজে যাইতেছেন সব ধর্মস্থানে — হিন্দুদের মন্দিরে, মুসলমানদের মসজিদে, খ্রীস্টানদের চার্চে, ব্রাহ্ম মন্দির, জৈন মন্দির, বৌদ্ধ বিহারে। এই সব মত ও সব লোককে তাঁর আপন বলিয়া বোধ হয়, তাই মিষ্টি লাগে।

অন্যান্য ভাগের মত শ্রীম-দর্শনের একাদশ ভাগ — 'যত মত তত পথ', 'ঈশ্বরের ইতি হয় না' — ঠাকুরের এই সব উদার মহাবাণীর প্রতিচ্ছবি শ্রীম-র জীবনে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, উহা সগর্বে বহন করে। এই একাদশ খণ্ড হিমাচলের মণ্ডিতে লিখিত।

বিনীত
গ্রন্থকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ) ঋষিকেশ, হিমালয়।
গুরুপূর্ণিমা, ১৯৬৯ খ্রীঃ, ১৩৬৭ সাল।

প্রথম অধ্যায়
যোগসূত্র সাধু

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। গ্রীষ্মকাল। সকাল সাতটা। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন জগবন্ধুর প্রতীক্ষায়। গদাধরকে পাঠাইলেন তাঁহাকে ডাকিতে। জগবন্ধু দ্বিতলের গৃহে বসিয়া শ্রীম-র কথার ডায়েরী লিখিতেছিলেন। জগবন্ধু শচী ও বিনয়কে লইয়া উপরে আসিলে শ্রীম তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — এই ছাদটা মেরামত করা দরকার। নিজেরাই করে ফেলা উচিত। নইলে কখনও মেরামত হবে না। ফেলে রাখতে নাই কোন কাজ অন্যের ভরসায়। এতে অপরের উপর নির্ভর করার mentality (মনোভাব) হয়ে যায়। নিজের initiative (উদ্যম) সর্বদা জাগ্রত রাখা উচিত সংসারে থাকতে হলে।

Mother bird (পাখীদের মা) বলেছিল — তোমরা চেঁচিও না, শান্ত হও। কাল ফসল কাটা হবে না। মালিক চাকরদের বলেছে তো ফসল কাটতে, তাই কাটা হবে না, দেরী আছে। কোন ভাবনা নাই।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — জান তো গল্পটা? একটা জমিতে একটা পাখী বাস করতো। তার কতকগুলি বাচ্চা ছিল। সে খাবার অন্বেষণে বের হয়েছে। তখন ঐ জমির মালিক এসে চাকরদের বললো, কাল ফসল কেটে ফেল, বেশ পেকেছে। এই কথা শুনে বাচ্চাগুলি প্রাণভয়ে চেঁচামেচি করতে লাগলো। মা ফিরে এসে তাদের এই দুর্দশা দেখে সব কথা শুনে, তাদের শান্ত হতে বললো। তারপর ফসল আর কাটা হয় না। একদিন মালিক নিজে এসে হাজির, হাতে কাস্তে। তখন মা বললে, এবার কাটা হবে। চল আমরা অন্যত্র যাই।

নিজে হাত না দিলে কাজ হয় না। 'অনপেক্ষঃ' — সাত্ত্বিক কর্মীর

একটি গুণ। পারি বা না পারি নিজের কাজে নিজে হাত দেওয়া উচিত। 'অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ' — (একজন ভক্তের প্রতি), তারপর কি?

ভক্ত — অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

(গীতা ১২:১৬)

শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এগুলি সাত্ত্বিক কর্মীর লক্ষণ। নূতন কাজে জড়াবে না। কিন্তু যে কাজে হাত দিয়েছে সেটা করবেই করবে। (শচীর প্রতি) 'গতব্যথঃ' — বলেছেন, আর একটা লক্ষণ সাত্ত্বিক কর্মীর। এর মানে জান? সমস্ত কাজ cheerfully (প্রফুল্ল চিত্তে) করা। বেজার না হয়ে, হাসিমুখে করা। কেন? না, সব কাজ যে ভগবানের জন্য করা। No pain is too much for God-realisation (ভগবান লাভের জন্য কোন দুঃখই দুঃখ নয়)। একজন যদি জানে, এ কাজটা করলেই দশ হাজার টাকা পাবে, তবে পরিশ্রম তার গায়ে লাগবে না। তেমনি ভক্তদের সব কাজ ভগবান লাভের জন্য — পরমানন্দ, পরম শান্তি লাভের জন্য। তাই কোনও কষ্ট বোধ হয় না। 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্' (গীতা ১৮:৬২)। কত বড় লাভের আশা, তাই কষ্টবোধ নাই। জগবন্ধুর উপর ছাদ মেরামতের ভার দিয়া শ্রীম গৃহে প্রবেশ করিলেন অন্য কাজে।

অপরাহ্ন পাঁচটা। চারতলের স্বীয় কক্ষে শ্রীম উপবিষ্ট বিছানার উপর পশ্চিমাস্য। দক্ষিণ দিকে বেঞ্চে বসা শচী, গদাধর ও অন্তেবাসী। শ্রীম শচীকে মনুসংহিতা পড়াইতেছেন। প্রথমে বিদ্যার্থীর কর্তব্য, পরে গৃহস্থের কর্তব্যসূচক শ্লোকগুলি পড়িয়া শুনাইতেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করিতেছেন। অন্তেবাসী কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কয়েকটি প্রশ্ন। শ্রীম চুপ করিয়া পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। তারপর একটি শ্লোক বাহির করিয়া উহা পড়িয়া কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এই শুনুন মনু বলছেন, (মনু ৪:৬৩) কৌতূহলী হওয়া ভাল নয় সব বিষয়ে। যার যা দরকার নাই, তা জিজ্ঞাসা করাও মুস্কিল। যদি বল, জিজ্ঞাসা করলে কি হয়? তার উত্তর ঐ গল্পটি।

(শচীর প্রতি) জান সেটি?

শচী — আজ্ঞে না — কোনটি?

শ্রীম (সহাস্যে) — তা হলে শোন। একটি পথিক চলতে চলতে একটা বনে গেল। রাত হলো। ঐ বনের ভিতর একটু দূরে একটা বাড়ি দেখে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। একটা ঘরে বসবার বেশ ব্যবস্থা আছে। আর একটা ঘরে একটি সুন্দর বিছানা আছে। সামনে টেবিল, তাতে flower vase (ফুলদান)। তাতে রয়েছে টাটকা সুগন্ধি ফুল। পথশ্রান্ত হয়ে পথিক ঐ ঘরের দরজা খুলে ঘরে গিয়ে বসলো, আর ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করতে লাগল। একটু পর ঐ বিছানাটিতে শুয়ে পড়লো। আর ভাবছিল, আহা কি সুন্দর আরামের বিছানা! শুয়েই দেখতে পেল পাশের একটা ঘরের দেওয়ালে লেখা — 'এ ঘর খুলিও না'। দেখেই কৌতুহল হল ওটাতে কি আছে দেখতে। তাই তার ঘুম হচ্ছিল না। শেষে ভেবে স্থির করলো, ও ঘরটা দেখতেই হবে। উঠে গিয়ে যেই দরজা খুললো অমনি একটা ভূত এসে তাকে ধরতে যাচ্ছে। সে তখন চীৎকার করে প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলো। রইল পড়ে আরাম বিছানা, রইল পড়ে ফুলের সৌন্দর্য। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলো। আর ভূতও পিছে পিছে অনুসরণ করছিল। রাস্তায় একটা নদী এসে পড়লো, পথিক ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা পার হয়ে গেল। তখন ভূতটা রাগে ওপার থেকে ভয় দেখিয়ে শেষে চলে গেল। ভূতরা বুঝি জলকে ভয় করে (সকলের হাস্য আর শ্রীম-র চোখে ও মুখে বালকের দুষ্ট হাসি)। এমনতর ব্যাপার কৌতুহলী হওয়া!

এবার আচার্য ও গুরুগৃহবাসীদের প্রসঙ্গ পাঠ হইতেছে। বিদ্যার্থীরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে। তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী। এর উপর আবার গুরুসেবা।

শ্রীম (একজন অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারীর প্রতি) — গুরু হলে খুব মজা, কি বল? চেলারা সেবা করবে সব। আচ্ছা, তুমি শিষ্য করবে না? (ব্রহ্মচারী হাসিতেছেন)। দাঁড়াও না, নিশ্চয় করবে — দু একটা অন্ততঃ। বাবা, সংসারে যা কষ্ট, কে শিষ্য না করে! দেখবে, করবে (সকলের হাস্য)।

অস্পৃশ্যদের জন্য মনুর বিধান পাঠ হইতেছে।

একজন ভক্ত — মনুর অস্পৃশ্যদের উপর ব্যবহার আর অপরাধীর উপর দণ্ডবিধান পাঠ করলে মনে হয়, এ মানুষের রচিত নয়, নির্দয়তার চূড়ান্ত ব্যবহার। কয়েকজনের স্বার্থের জন্য অপরের পশুবৎ আচরণ।

শ্রীম — মনু ঐ রকম বলছেন। এখন এরা বুঝি অন্য রকম করতে চেষ্টা করছে — দেশের লোকেরা। এরাও করুক আর এও আছে। দেখা যাক্ কোন্‌টা দাঁড়ায় তাঁর ইচ্ছায়।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — মনুর মতে ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করে খাবে। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি থেকে ভিক্ষা নিবে না। ভিক্ষার সময় মৌন থাকবে, অন্তরে জপ করবে। শুচি থাকবে স্নানাদি দ্বারা। বিলাসদ্রব্য, যেমন — গন্ধমাল্য, নৃত্যগীতাদি, দ্যূতক্রীড়াদি, মদ্যপানাদি বর্জনীয়। পরনিন্দা, অনিষ্টচিন্তন, মিথ্যাভাষণ বর্জন করবে। নিত্য পূজা পাঠ, জপ ধ্যান করবে। সর্বপ্রকারে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করবে না।

গৃহস্থদের কর্তব্য দেবতা-সাধু-ভক্তসেবা, অতিথিসেবা। আজকালের 'guest' (অতিথি)-সেবা নয়। গৃহে দেবসেবা থাকবে। পূজা, শাস্ত্রালোচনা, পরের উপকার, গুরুজনদের আজ্ঞাবহতা, সত্যাচরণ, পরনিন্দাবর্জন — এই সবও থাকবে।

ঠাকুর মা-ঠাকরুণকে জগদম্বা বলে পূজা করেছিলেন। সারাজীবন এই ভাব রক্ষা করেছিলেন। মনুও বলছেন ২য় অধ্যায়ে — 'যে ঘরে স্ত্রী পূজিতা হন সেখানে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত। যে ঘরে নারীর অপমান হয় সেখানে ধর্মকর্ম সব নিষ্ফল।'

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাঽফলাঃ ক্রিয়াঃ।। ৩।৫৬

ধর্মের বাহ্য লক্ষণগুলিও বেশ দিয়েছেন মনু। এইগুলি প্রায় সন্ন্যাসীর লক্ষণ।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।। ৬।৯২

এসব বেশ কথা। এসব ব্রহ্মদর্শনের সাধন। সকল দেশের সকল

লোকের জন্য প্রযোজ্য। ভগবানে যার সত্যিকার বিশ্বাস, তাতে এসব দৈবীভাব আপনিই প্রকটিত হয় — দেশ কাল জাতির অপেক্ষা নাই এতে।

সন্ধ্যার বৈঠক বসিয়াছে চারতলার ছাদে। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন। শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চে তিন দিকে বড় জিতেন, শুকলাল, শচী, মনোরঞ্জন, শান্তি, বড় অমূল্য, অমৃত, নলিনী, বলাই, ডাক্তার, বিনয়, যতীন, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ উপবিষ্ট। একঘন্টা ধ্যানের পর, কতকগুলি ভজন গাহিলেন শ্রীম নিজে। ঠাকুরের গান সব জগন্মাতার সম্বন্ধে — 'মজলো আমার মন ভ্রমরা', 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি', 'কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী' — ইত্যাদি। তারপর শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। এইবার আশুবাবুর কথা কহিতেছেন। তিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বহু গুণের আশ্রয় ছিল তাঁ'তে। এদিকে 'Sir' উপাধি লাভ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের। হাই কোর্টের চিফ্ জাস্টিস্, আবার ইউনিভারসিটির জনক বললেও হয়। কত বড় স্কলার!

ভগবান লাভ করাই যে মানুষজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং এই রাস্তাই যে সকলের শ্রেষ্ঠ পথ, এই সম্বন্ধেও তিনি খুব সচেতন ছিলেন। একবার সন্তদাস বাবাজীকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। এঁর পূর্বের নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। হাই কোর্টের উকীল ছিলেন আর আশুবাবুর বন্ধু ছিলেন। লিখেছিলেন, 'ভাই, আমরা সব অনিত্য নিয়ে রয়েছি। তুমিই ঠিক রাস্তা ধরেছ।' সন্তদাসজী আমাকে বলেছিলেন।

এসব কথায় মনে কর, কত উপকার হবে লোকদের। সংসারী লোক সংসারী লোকের কথা শুনে বেশী। তাই ভগবান মাঝে মাঝে এমন করান। ভাল লোক, বড়লোকের মুখে এসব উচ্চ কথা বলান। তবেই সাধারণ লোক মানবে।

গীতায় আছে —

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ (গীতা ৩:২১)

একজন ভক্ত — ঠাকুরের কথা শুনে অন্য কারো কথা ভাল লাগে না।

শ্রীম — হাঁ, তা বটে। কিন্তু জহুরী ক'জন? হাতের আঙুলে গোনা যায়। অধিকাংশই ঐ বেগুনওয়ালা, না হয় কাপড়ওয়ালা। ঈশ্বরের দাম, ঈশ্বরীয় ব্যক্তিদের দাম দিবে নয় সের ব্যাগুন, নয়তো হদ্দ ন'শো টাকা। কেবল জহুরীই দাম দেয় লাখ টাকা।

রাত্রি দশটা। শ্রীম উঠিয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

আজ ৯ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, বুধবার, শুক্লা সপ্তমী ১৬ দণ্ড। ৪০ পল।

২

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। এখন সকাল আটটা। শ্রীম বেঞ্চে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। তাঁহার সম্মুখে সভাগৃহে বসা — জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, শচী প্রভৃতি।

আজ ১০ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা অষ্টমী, ১২।৩০ পল।

শ্রীম শচীকে কলেজের অধ্যয়নে নিযুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর। তাই তাহাকে নানাভাবে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — তুমি পড়, আমাদের help (সাহায্য) নিয়ে পড়। আমরা help (সাহায্য) করবো। তা হলে ছ' মাসে বি.এ. কোর্স শেষ হয়ে যাবে।

পড়ান একটা আর্ট। ভাল করে অপরকে পড়াতে হলে, সেই আর্টটি develop (বিকাশ) করা চাই আন্তরিক চেষ্টা করে। প্রথম কথা হচ্ছে, শিক্ষকের আন্তরিক ইচ্ছা চাই শিখাবার জন্য। দ্বিতীয়, চাই ভাষা। যে ভাষায় মায়ের সঙ্গে কথা হয় সেই ভাষায় বোঝাতে হয়। তৃতীয়, যে পরিমাণ শিক্ষা ছেলে নিতে পারে তাকে সেই পরিমাণ বিদ্যা দিতে হবে। ছেলের brain-কে (মস্তিষ্ক) tax (পীড়ন) না করে শিক্ষা দিতে হবে। ঠাকুর বলতেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল, শোনার চাইতে দেখা ভাল। কাজেই ছেলেকে বেশী বই না পড়িয়ে শিক্ষক পড়বে বেশী। আর সেই পাঠ মুখে মুখে ছেলেকে শোনাবে। তারপর পাঠ্য বিষয় সম্ভবমত ছেলের চোখের

সামনে ধরবে — ছবি, ডায়গ্রাম, ইত্যাদির সাহায্যে। কখনও বা actual scene-এ (ঘটনাস্থলে) নিয়ে যাবে। এই সব উপায় উত্তম শিক্ষার।

কলেজে আর কি পড়া হয় — খালি লেক্‌চার দেয়। শিক্ষকদেরই clear idea (পরিষ্কার ধারণা) নাই। তা' বোঝাবে কি, শিখাবেই বা কি। অধিকন্তু বিজাতীয় ভাষা। ভাষাই শিক্ষা হল না। এখন বোঝাবে কি? আর ছেলেই বা কি শিখবে?

এখানকার মত শিক্ষার দুরবস্থা জগতে কোথাও নাই। তাই এখানকার পড়ায় বিশেষ কিছু জ্ঞান হচ্ছে না। কেবল ডিগ্রিই নিচ্ছে — বি.এ., এম.এ.। কিন্তু culture (চর্চা) হচ্ছে কই? জাপানে নিজের ভাষায় শিক্ষা দেয়।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — বিদ্যাসাগর মশায় যখন কলেজ start (আরম্ভ) করেন, তখন authorities (কর্তৃপক্ষ) সবই সাহেব। তাঁরা খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, বেশ কাজ করছো। তুমি পারবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় উত্তর করলেন, হাঁ। ছেলেরা পাস করবে কিন্তু বিদ্যা হবে না (হাস্য)। আহা, কি পাকা কথাই বলেছিলেন।

দেখ না, প্রফেসারগুলিরও clear idea (পরিষ্কার ধারণা) নাই। তার ওপর আবার অন্য ভাষায় লেকচার দিচ্ছে। নিজেরা মনে করছে, ছেলেদের খুব বিদ্যা হচ্ছে। কিন্তু আদপে কিছুই হচ্ছে না। কেবল গিলছে কথাগুলো, হজম হচ্ছে না। মুখস্থ করে তাই লিখে দিচ্ছে তাতেই পরীক্ষা পাস হচ্ছে। বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে এই গিলিত বিদ্যার কোনও সম্পর্ক হচ্ছে না। তাই বুদ্ধির কোনও সংস্কার হচ্ছে না। এই বুদ্ধির সংস্কারের নামই 'কালচার'।

আবার যেখানে বিষয় কঠিন, শিক্ষক নিজে বুঝতে পারছেন না, এটা ওটা পাঁচটা দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে কার্যসিদ্ধি করছেন। কিন্তু ছেলেরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছে।

দেখ না, এই বইগুলি (বি.এ.-র পাঠ্য পুস্তক)। পরীক্ষার কতক দিন আগে তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করিয়ে দেবে। দুটো বছর অমনি গেল। কিন্তু যদি প্রথমেই বইয়ের contents (সূচীপত্র) সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তা' হলে ছেলেরা দু' বছর সেটা ভাবতে পারে। তা না করে তাড়াতাড়ি কতকগুলি cramming (অর্থ না বুঝে মুখস্থ) করাবে।

এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে ওটা আর এখন ছাড়তে পারছে না।

আমরা চেষ্টা করছি এখানে (মর্টন স্কুলে) ঐ উত্তম নিয়মগুলি পালনের, যাতে ছেলেরা বাংলায় চিন্তা করতে পারে পাঠ্য বিষয়, যাতে বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কার হয়, যাতে পাঠ্য বিষয় খালি গলাধঃকরণ না করে। কিন্তু শিক্ষকরা পূর্ব অভ্যাস ছাড়তে প্রায় রাজি নয়। এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে ঘুরে ফিরে খালি ঐ লেকচার দেয়। কি রকম করে বললে, শেখালে ছেলেরা ধরতে পারে সে বিষয় জানে না, চিন্তাও করবে না। নিজেরাও এই ভাবে শিক্ষালাভ করেছে কিনা।

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম স্বীয় কক্ষে বিছানায় বসিয়া শচীকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন — কালিদাসের শকুন্তলা।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — দেখ কি সুন্দর description (বর্ণনা)। এই শ্লোক ক'টা মুখস্থ রাখলে মনন ও নিদিধ্যাসনের কাজ হয়ে যায়। আর মনকে নিয়ে যায় ঐ স্থানে — বনে, নির্জন তপোবনে। এখানে থেকেও তোমার তপোবনে বাস হতে পারে মনে। কারণ মন যেখানে, তুমিও সেখানে, শরীর যেখানেই থাকুক না কেন। যোগীরা এইভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। শরীর সর্বদা অনুকূল স্থান বা অবস্থায় থাকে না। কিন্তু অভ্যাস করলে মন এই শরীর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার। এই ভাবে সংসারের শোক দুঃখ জ্বালা জয় করতে পারা যায়। ভগবানে শেষে উঠিয়ে নিয়ে রাখা মনকে। এরই চরম অবস্থা সমাধি। তখন বাইরের গুরুতর দুঃখেও মন বিচলিত হয় না। 'যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' (গীতা ৬:২২)

প্রথম শ্লোকটি মুখস্থ কর। আর ঐটিও 'রম্যাণি বৃক্ষাণি —'। আর, 'ভূত্বা চতুরন্তমহীস্বপত্নী'। সংস্কার সম্বন্ধে শ্লোকও মুখস্থ করতে হয়। কণ্বমুনির আশ্রমের কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর বর্ণনা! পড় পড়, পড়ায় ডুবে যাও।

এখন সন্ধ্যা। ভক্তসভা বসিয়াছে ছাদে। শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। আর ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে তিন দিকে বেঞ্চে বসা — ডাক্তার, বিনয়, শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শচী, শান্তি, রমেশ, জগবন্ধু, বলাই প্রভৃতি। সকলে ধ্যান করিলেন কিছুক্ষণ। এবার ভজন

হইতেছে। শ্রীম গাহিতেছেন।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥

গান। শ্যামাধন কি সবাই পায় কালীধন কি সবাই পায়।

গান। কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।

গান। আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে॥
এ দেহ আপনার নয় রে সদা রিপু সঙ্গে চলে।
তবে আন রে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে॥
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে।
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥

গানের পর কথা হইতেছে — ধর্মের ব্যবহারিক প্রসঙ্গ। বড় জিতেন কথাপ্রসঙ্গে অনেকগুলি অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীম-র তাহা পছন্দ হয় নাই। উকীল উনি, হাই কোর্টের বেঞ্চ-ক্লার্ক।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ফিল্ড সাহেব হাই কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁর কোর্টে একটা বড় case (মামলা) হচ্ছে। দুই পক্ষেই বড় বড় ব্যারিস্টার। Arguments-এর (যুক্তি) ধস্তাধস্তি চলছে। জজ ব্যতিব্যস্ত। সেই সময়ে তাঁর বেঞ্চ ক্লার্ক একটা suggestion (ইঙ্গিত) দিল। জজ রেগে অস্থির হয়ে বললেন, why do you suggest? (কেন তুমি ইঙ্গিত দিচ্ছ)। দু পক্ষের কাউনসেলদের তুমুল লড়াই মনোযোগপূর্বক শুনতে হচ্ছে। আবার আইনের মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে কিনা তা' ভাবতে হচ্ছে — কত বড় concentration (মনোযোগ)! এর ভিতর suggestions দিয়ে মনকে বিচলিত করা কি উচিত? তাই ধমক দিলেন। আর suggest (ইঙ্গিত) করবার তার কি অধিকার আছে? অযাচিত উপদেশ ক্বচিৎ ভাল হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফল খারাপ হয়।

বড় জিতেন (দুঃখিত হইয়া) — কি করি, বলে বলে অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। (জগবন্ধুকে দেখাইয়া) এঁরাও সব অনেক কথা জানেন, কিন্তু চুপ করে শোনেন। আমার মুখ থেকে আপনি কথা বের হয়ে যায় — এখন কি করা যায়?

শ্রীম — চুপ করে থাকা ভাল। এতে জমে। নইলে সব বের হয়ে যায়। তাই সাধনার প্রথম অবস্থায় মৌনব্রত অবলম্বন করার শাস্ত্রীয় বিধি। অভ্যাস করলেই সব হয়।

একজন ভক্ত — Suggestion (ইঙ্গিত) কি একেবারেই দিতে নাই?

শ্রীম — তা নয়। কিন্তু দেখে সেটা ঠিক করা। যদি কেউ নেবার মত লোক হয় তবে দেওয়া যায় — যদি জানা থাকে কিছু। ধর্ম বিষয়ে, ঈশ্বরের বিষয়ে suggest (উপদেশ) করা যেতে পারে — যিনি ঈশ্বর-দর্শন করেছেন তাঁর কথা বলে অথবা শাস্ত্রের কথায়। এ সব তো বৈষয়িক ব্যাপার নয় যে worldly wisdom (সাংসারিক অভিজ্ঞতা) জাহির করলুম। ঈশ্বরীয় ব্যাপারে ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যে নেবে এমন লোককে। যে না নেবে তাকে বলে লাভ কি — to cast pearls before a swine (উলুবনে মুক্তা ছড়ান)? হিতোপদেশে কি আছে?

অন্তেবাসী — পয়ঃ পানং ভূজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

শ্রীম — অর্থাৎ উল্টো উৎপত্তি হয় — বিষফল হয় অমৃতের বদলে। তারপর তোমার উপদেশ শুনছে কে? স্বভাব ঠেলে ফেলে দিচ্ছে যে — 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি' (গীতা ১৮:৫৯)।

ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়া বড়ই কঠিন। তাই শ্রীকৃষ্ণ যাকে তাকে উপদেশ দিতে মানা করেছেন — "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গীনাম্' (গীতা ৩:২৬)। সে যে নিতে পারবে না। তোমার কথায় তার বিশ্বাস হবে কেন? তার মত হয়ে নিচে নেমে এসে আচরণ কর। তাতে তোমার প্রতি তার বিশ্বাস হবে। তখন তোমার কথা হয়তো শুনতে পারে। কিন্তু এতে খুব শক্তির প্রয়োজন। নিজে 'বিদ্বান' অর্থাৎ ঈশ্বরদ্রষ্টা হয়ে আর 'যুক্ত' অর্থাৎ সর্বদা ভগবানের সঙ্গে লগ্ন থেকে, তারপর অজ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে থেকে তার মত লোকব্যবহার ক'রে, তার বিশ্বাস উৎপাদন করে, তাকে ওপরে তুলে আনা — ঈশ্বরে লগ্ন করা — এই বিধান শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের সব কথা নিষ্কাম জ্ঞান ভক্তির

কথা। সাধারণ লোকের এসব পছন্দ হবে কেন? তাই এসব কথা যাকে তাকে বলা উচিত নয়। আগে ফিল্ড (জমি) তৈরী হউক তখন বলা যেতে পারে। তাদের মন ভোগবাসনায় পূর্ণ। তাদের রুচি হবে কেন এসব কথায়? অনেকটা মেঘ কেটে গেলে তখন কাজ হতে পারে। একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরে কি কুইনাইন কাজ করে?

একজন সকাম ভক্তের কাছে নিষ্কাম ভক্তির কথা বললে সে বুঝতে পারবে না, কাজ হবে না। যখন সাংসারিক শোকতাপে তার মনের আবরণ অনেক গলে যায়, পাতলা হয়ে যায় তখন বলা যেতে পারে। তখন ঢুকিয়ে দিতে হয় জ্ঞান ভক্তির কথা। তখন খানিকটা নেবে। আগুনে পুড়ে যখন লোহা লাল হয় তখন পিটলে গড়ন হয়। জুড়িয়ে গেলে হাজার পেট — কাজ হবে না, ভেঙ্গে যাবে। তাই শোকতাপ দুঃখ দেন ভগবান। মনের আবরণ পাতলা হলে তখন খানিকটা ঢুকিয়ে দেওয়া জ্ঞানভক্তির কথা।

এবার 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন, তিন রকমের সাধু — সত্ত্বগুণী, রজোগুণী ও তমোগুণী। সকলেই পূজ্য ও প্রণম্য।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — শুনছেন শুকলালবাবু, ঠাকুর বলছেন এই তিন রকম সাধুই সাধু। সাধুসেবা ভাল, যেমন সাধুই হোক। World (সংসার) আর God (ঈশ্বর) — এর link (যোগসূত্র) হল সাধু — যেমন bridge (সেতু)। সত্ত্বগুণী সাধু— যেমন শুকদেব, অন্তরেও শান্ত বাইরেও শান্ত। রজোগুণী সাধু নিষ্কাম কাজ করে, উপদেশ দেয়, বক্তৃতা দেয়, অধ্যাপনা করে — যেমন শৌনক ঋষি। তমোগুণী — যেমন দুর্বাসা। সকলের ভিতরই একই বস্তু, ব্রহ্মজ্ঞান রয়েছে। বাইরের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। সকলেরই অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব। তাই তিনজনই প্রণম্য — তিনজনই সেব্য। তাতে কল্যাণ হবেই।

সাধুসেবা করা কঠিন, ছাড়া সহজ। অনেক জন্মের শুভ কর্ম সঞ্চিত থাকলে সাধুর উপর শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা পাকা না হলেই এই — আজ খুব সেবা করলুম, কাল ছাড়লুম। একটানা সেবা করে যেতে হয় ভগবৎবুদ্ধিতে যাবৎ না কোনও অনৈতিক কার্য দেখা যায়। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবাই ভগবৎভক্তি জ্ঞানলাভের একটি মাত্র পথ।

একটি ভক্ত অর্থ দিয়া একটি সাধুর সেবা করিতেছেন অনেক দিন হইতে। তিনি এখন উহা হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। শ্রীম শুনিয়া ভাবিত হইয়াছেন। অহেতুক কৃপা করিয়া গুরুরূপী শ্রীম ভক্তের পরম কল্যাণের পথ বারংবার বলিয়া দিতেছেন। তাই বুঝি আজ কথামৃতের এই পাঠ ভক্তটিকে শুনাইতেছেন। গুরুর ঋণ অশোধনীয়।

কলিকাতা। ১০ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ।
২৬শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার।
শুক্লা অষ্টমী ১২।৩০ পল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতির্ময় কামারপুকুর

১

মর্টন স্কুলের দ্বিতল। সকাল আটটা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। শ্রীম বারান্দায় বেঞ্চে উপবিষ্ট দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বসিবার ঘরে ভক্তগণ — জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, শচী প্রভৃতি।

কামারপুকুর হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ঐ পুণ্যভূমির যাবতীয় সংবাদ লইতেছেন — লাহাদের বাড়ি, মানিক রাজার আমবাগান, ধনী কামারনীর ভিটা, ঠাকুরের ঘর, রঘুবীর ইত্যাদি। ভক্তটি এই সকল কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, আমরা একটা স্কুল করেছি। এই সম্বন্ধে আপনার মূল্যবান উপদেশ শুনতে ইচ্ছা। তাই আজ এসেছি।

শ্রীম — আসল কথা, পড়া ভাল হওয়া চাই। আর discipline (নিয়মানুবর্তিতা)। এই দুটো পয়েন্টে নজর রাখলে অন্যগুলি আপনি আসবে। যাঁরা পড়াবেন তাঁদের বিদ্যাব্রতী হওয়া চাই। এ কাজটির ওপর ভালবাসা চাই। আর উচ্চ চরিত্র হওয়া দরকার।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের দিক দিয়ে tact (নৈপুণ্য) আর discipline (সুশৃঙ্খলা)। শুধু ডিসিপ্লিন করতে গেলেও হবে না। সঙ্গে সঙ্গে tactful (কৌশলী) হওয়া চাই।

আর যিনি যে বিষয় পড়াবেন সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। ছাত্ররা এটা বুঝতে পারে অনায়াসে। আর এতেই ওরা আকৃষ্ট হয়। ওরা বিদ্যার উপাসক কিনা! তাই যেখানে বিদ্যা, সেখানেই শ্রদ্ধা, ভালবাসা।

বড় শক্ত কাজ — গুরুর কাজ কিনা! বিদ্যা, অধ্যাপনায় অনুরাগ আর উচ্চ চরিত্র, শিক্ষকের এগুলি চাই-ই। তারপর হলো শেখাবার আর্ট। কতকগুলি বকুনি ঝাড়লেই পড়ান হ'লো না। ছেলেদের মন নূতন — অজানা বিষয়ে যেতে চায় না। এমন interest (মজা) create (সৃষ্টি)

করতে হবে যে ছাত্রদের জানবার ইচ্ছা, কৌতূহল, বেড়ে যাবে। ছবি, ম্যাপ, ড্রইং — এ সবের সাহায্যে ছেলেদের ভিতর বিদ্যা, নূতন ভাব প্রবেশ করাতে হবে। মনের উপর হাতুড়ি পিটে নয়। চোখে দেখিয়ে, কানে শুনিয়ে, হাতে ছুঁইয়ে বিদ্যা ছেলেদের ভিতর ঢোকাতে হয়। ধরুন, 'গীতা' — এই বইখানা সম্বন্ধে ছাত্রকে পড়াতে হচ্ছে। এতে হেন আছে, তেন আছে, এতসব না বলে, প্রথমে একখানা গীতা ছেলের হাতে দিন। তারপর বলুন, এই বইখানা গীতা। এবার ওর ভিতর থেকে একটি শব্দ শুনিয়ে দিন, যেমন 'স্থিতপ্রজ্ঞঃ'। ছেলে এই স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণের সাহায্যে গীতার কথা মনে রাখবে সারা জীবন। তিনটি ইন্দ্রিয় কাজে লাগছে কোনও কোনও বিষয়ে, বাকী দুটো ইন্দ্রিয়ও — জিহ্বা ও নাসিকা — কাজে লাগাতে হয়।

ঋষিদের কাজ এটি, এই বিদ্যাদান। বড় পবিত্র আর উচ্চ কর্ম। ত্যাগ না থাকলে এ লাইনে success (কৃতকার্য) হতে পারে না। অন্য কাজ, জুটলো না, চল মাস্টারি করাই যাক্ — এরকম mentality-তে (মনোবৃত্তিতে) শিক্ষক হতে পারে না। বিদ্যাদান, এর পরই ব্রহ্মবিদ্যাদান। অত উঁচু কাজ এটি। অন্নদান, জীবনদান, বিদ্যাদান, ব্রহ্মবিদ্যাদান — একটার থেকে অপরটা বড়। লৌকিক বিদ্যা দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও মার্জিত হলে, বিচারশক্তি প্রখর হবে। সেই বিচার শক্তি দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ হয়। বেদে আছে একথা — 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' (কঠো ১:৩:১২)।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — ভক্তদের মধ্যে আমরাই যাই প্রথম কামারপুকুর। তখন ঠাকুরের শরীর আছে।

ভক্ত — আপনি স্কুলে — পাঠশালায় গিছলেন, মিঠাই খেতে দিছলেন ছেলেদের। তাঁরা এখনও সেই কথা বলেন। তাঁরা এখন প্রৌঢ়।

শ্রীম — ঠাকুর তখন চোখে একটা চশমা পরিয়ে দিছলেন। তাইতে কামারপুকুরের সব ভাল লাগতো। সমগ্র গ্রামটি একটা জ্যোতিঃ দিয়ে ঢাকা দেখেছিলাম। সব জ্বলজ্বল করছে, সব চৈতন্যময়। (সহাস্যে) একটা বিড়ালকে জ্যোর্তিময় দেখলাম রাস্তায়। অমনি প্রণাম — একেবারে

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। যা দেখছি সব জ্যোতির্ময় আর অমনি ঢিপঢিপ করে প্রণাম।

ঐ লোভে আর একবার যেতে চেয়েছিলাম। ঠাকুর তখন কাশীপুরে অসুস্থ। বললেন — না, এখন থাক্, আমার সঙ্গে যেও। সেটি হয় নি। কত লোকে যাবে ঐ মহাতীর্থে। ওখানকার ধূলিকণা পবিত্র। (ভক্তের প্রতি) আপনারা ধন্য, ওখানে জন্মেছেন।

ভগবান জন্মেছেন ঐখানে। এরপর মহাকাণ্ড হবে ওখানে। দেশ যত ওপরে উঠবে তত ঠাকুরকে বুঝবে, তত ঐ মহাতীর্থকে লোকে জানবে। জাগ্রত হবে কামারপুকুর জয়রামবাটি।

কামারপুকুর হইতে আসিয়াছেন বলিয়া ঐ লোকটির কত আদর, কত যত্ন! নিজ হাতে তাঁহাকে মিষ্টিমুখ করাইতেছেন। ভক্তরা কেহ কেহ ভাবিতেছেন, এ যেন সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। শ্রীম-র আচরণে এই অলৌকিক দৈবী ভাব অভিব্যক্ত।

অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শান্তি একজন বন্ধুকে লইয়া আসিয়াছেন। ইনিও পড়েন। সম্প্রতি বি.এ. পরীক্ষা দিয়াছেন। ছোট রমেশও পাশে বসা, বি.এ. পড়েন। বড় রমেশও বি.এ. পড়িতেছেন।

শচীকে পড়ায় মনোনিবেশ করাইবার জন্য শ্রীম-র উৎসাহ প্রদানের অন্ত নাই। কিছুদিন ধরিয়া তাঁহাকে বি.এ.-র সংস্কৃত পাঠ্য নিজে পড়াইতেছেন। আর অন্তেবাসীকে দিয়া শচীকে ফিলজফি পড়াইতেছেন। শ্রীম বলেন, বিদ্যা অর্জনে নিরত থাকিলে সহজে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হয়। তাহাতে ভগবৎ বিষয়েও প্রীতি ও আকর্ষণ হয়। শ্রীম তাই বিদ্যা ও বিদ্যার্থীর গুণগান করিতেছেন।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — এই দেখ, সব বিদ্বান লোক এসেছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ কর। তা হলে বিদ্যা অর্জনে মন যাবে। যাদের সঙ্গ করবে তাদের ভাব পাবে। এঁরা সব পণ্ডিত লোক কিনা! এঁদের সঙ্গ কর, তা হলে এঁদেরই মত হবে।

বর্ষার সম্ভাবনায় কথা কহিতে কহিতে শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন, স্বীয় কক্ষদ্বারের পাশে চেয়ারে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণও উত্তর-

দক্ষিণ মুখোমুখি হইয়া বেঞ্চে বসিয়াছেন — শচী, শান্তি, সঙ্গী, ছোট রমেশ, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, সুকুমার, বলাই, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি।

ইতিমধ্যে ভৃত্য হ্যারিকেন রাখিয়া গেল। শ্রীম তাই সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন ভক্ত সঙ্গে। কিছুক্ষণ ধ্যানের পর আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি জনান্তিকে) — উনি (শচী) শকুন্তলার অনেকগুলি শ্লোক কণ্ঠস্থ করেছেন। (শচীর প্রতি সস্নেহে) না গা? এবার আর পড়া ছাড়ছ না তা হলে — taste (আস্বাদ) পাওয়া গেছে যে!

শ্রীম (গম্ভীরভাবে ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল, শোনার চাইতে দেখা ভাল। এই dictum (নীতিবাক্য) মনে রাখলে অন্য সব ঠিক হয়ে যাবে। এটা divine dictum (দৈব নীতিকথা)।

(স্বগত) আর বাপু কাঁহাতক পড়া যায়। (ভক্তদের প্রতি) যারা পড়েছে তাদের মুখে শুনে নিতে হয়। আর কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া। কষ্টিপাথর হলো ঠাকুরের মহাবাক্য।

উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। বিদ্যালাভ সহায়। বিদ্যাতে বিচারশক্তি বাড়ে। তা দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ইচ্ছা হতে পারে। তাই বিদ্যালাভের দরকার।

পরস্পর আলাপ করতে হয় আর cultivated men-দের (যে সব লোক চর্চা করে তাদের) association-এ (সাহচর্যে) থাকতে হয়। তা হলে ওঁরা যা ভাবেন, যা করেন সেগুলি নিজের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ক্রাইস্টের কথা শুনে বড় বড় পণ্ডিতরা স্তম্ভিত হয়ে পড়তো। বলতো, 'For he taught them as one having authority' (তিনি একজন উচ্চ অধিকারীর মত কথা ক'ন)। তাঁর সঙ্গে থেকে নিরক্ষর জেলে মালোরা কত বড় হলেন — সেন্ট পিটার প্রভৃতি। জগৎগুরুর আসনে বসেছিলেন তাঁরা। ঠাকুর কি পড়ালেখা করেছিলেন? জগন্মাতা নিজে শিখিয়েছিলেন। তাই বড় বড় পণ্ডিত, মানী লোক যাঁদের কথা জগতের লোক শুনতো — তাঁরা গিয়ে বসে থাকতেন হাত জোড় করে। নিজের চক্ষে আমরা এসব দেখেছি।

সঙ্গগুণে সব হয়। বিদ্বান লোকদের সঙ্গে থাক, বিদ্যা লাভ হবে।

ইংরেজরা সকলে তেমন লেখাপড়া জানে না। কিন্তু, তাদের সোসাইটি cultivated (সুশিক্ষিত) হওয়ায় সঙ্গগুণে সকলেই cultivated (সুশিক্ষিত) হয়ে উঠে।

একজন পরমহংসদেব সম্বন্ধে জানতে চায়। কি করে তা হয়? না, যাঁরা তাঁকে সর্বদা ভাবছেন সেই সাধুদের সঙ্গ করলে তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারবে বেশি আর সহজে। ঠাকুর বলতেন, যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। ভাবগুলি রূপ ধারণ করে মানুষরূপে।

২

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি) — ওয়েস্টার্ন পণ্ডিতদের বই পড়া কেন? ফিলজফির জন্য নয়। তবে কেন? না, এই জানবার জন্য যে এতে কিছু নাই। তাদের সাহিত্যও তাই। তবে সায়েন্সে তাদের মত দেখা উচিত — ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, সায়েন্স — এগুলোতে।

শ্রীম (শান্তির সঙ্গীর প্রতি) — Life of Schiller-এ (সিলারের জীবনীতে) কি আছে, আপনি পড়েছেন তো?

সঙ্গী — আজ্ঞে হাঁ। ইনি একজন বিশিষ্ট জার্মান, এডুকেশন রিফর্মিস্ট (শিক্ষা সংস্কারক)।

শ্রীম — উনি কোন্ কোন্ গ্রেট ম্যানদের (বড় লোকের) সঙ্গে meet (সাক্ষাৎ) করেছিলেন এ সব কথা আছে। এসব গ্রেট ম্যান তাদের ideal-এর (আদর্শের) মতে। কেহ বড় সাহিত্যিক, কেহ বড় ফিলজফার, এইসব। মিলের 'লিবারটি অপ স্পিচ', এ্যারিস্টটলের 'স্টেইট', 'সোসাল কন্ট্রাক্ট থিওরী', মডেন্থিয়াসের 'ডেডিকেটেড লাইফ', হোলডেনের — কি আছে এ সবে? Highest life-এর (সর্বোচ্চ জীবনের) সন্ধান আছে কি যাতে মানুষ দেবতা হতে পারে, সকল দুঃখের হাত থেকে নির্মুক্ত হতে পারে, পরমানন্দ লাভ করতে পারে, পরম শান্তির অধিকারী হতে পারে? না, এ পারে না ও সবেতে।

ওরা এসব বুঝতেই পারে না। আবার ফিলজফি শেখাতে আসা এদেশে — কি ধৃষ্টতা! তাই সোপেনহাওয়ার বলেছিলেন, 'It is to fire a bullet against a cliff' (এ যেন পর্বতগাত্রে গুলি ছোঁড়া)!

ধর্ম ও দর্শন শেখাতে আসে কিনা মিশনারিরা এদেশে। তাই দেখে এ কথা বলেছিলেন। সত্যবাদী লোক। এ দেশের ধর্ম ও দর্শন উনি চিনেছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'It has been the solace of life and it is the solace of my death' (আমার জীবন মরণের ভরসা এই মহামন্ত্র), তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই মহাবাক্যটি দেখে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।'

'Dedicated life'এর (উৎসর্গীত জীবন) মানে ওরা বুঝতে পারে নাই। গীতার মানে হলো ঠিক মানে। অপরের জন্য কাজ করা, ঈশ্বরার্থ কর্ম, নিষ্কাম কর্মযোগ। Patriotism (স্বদেশপ্রেম) কেন হতে যাবে এর মানে? হোলডেন এই বিষয়টি লিখতে গিয়ে গোলমাল করেছেন, বুঝতে পারেন নাই তার মানে।

Astronomy (জ্যোতিষ) পড়া, কি Logic (পাশ্চাত্ত ন্যায়শাস্ত্র) পড়া, ভাল। আমরা তো এই physical world-এ (বাহ্য জগতে) রয়েছি, তাই এসব পড়া উচিত। Logic (ন্যায়শাস্ত্র) পড়লে খুব acute intelligence (সূক্ষ্ম বুদ্ধি) হয়, বিচারশক্তি বাড়ে। Logic to Philosophy (ন্যায়ের সম্পর্ক দর্শনের সঙ্গে তেমন), যেমন Grammar to Literature (ব্যাকরণের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক)। আর Logic-এর (ন্যায়ের) 'Methods' (বিচারপ্রণালীগুলি) খুবই ভাল। Method of Agreement, Method of Difference, Method of Concomitant Variation (অন্বয়বিধি, ব্যতিরেকবিধি, সংযুক্ত পরিবর্তনবিধি) — এইগুলি দিয়ে ওয়েস্টে অনেক physical phenomena discover (বাহ্য জগতের বহু সত্যের আবিষ্কার) করেছে।

ভাষা হ'লো আর একটা সমস্যা। পরের ভাষায় কি পড়া যায়, না চিন্তা করা যায়! মাতৃভাষা না হলে উন্নতি হবে কি করে? এই এক দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে অন্য ভাষায় পড়ান হচ্ছে। মাতৃস্তন্য পান করতে করতে মায়ের সঙ্গে যে ভাষায় কথা হয় উহাই মানুষের নিজস্ব ভাষা।

উহাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ভাষা। শোকতাপ ক্রোধ এসব মাতৃভাষায় প্রকাশ হয় মানুষের।

প্রফেসারগুলিও তেমনি। ইংরেজীতে কেবল আবোল-তাবোল বকে। নিজের idea-ই clear (ধারণাই পরিষ্কার) নাই, আবার অপরের ভাষায় বলা। তাই ছেলেদেরও কিছু হচ্ছে না। এ-কান দিয়ে ঢোকে ও-কান দিয়ে বের হয়ে যায়।

কি আশ্চর্য! স্বপ্ন দেখার সময় কই, ইংরেজীতে তো স্বপ্ন দেখে না।

একজন আইরিশ কাউন্সিলার তাঁর নিজের ভাষায় বলছিলেন। তাঁকে ইংরেজীতে বলতে বলায় তিনি উত্তর করলেন, কেন আমি কি subject nation (পরাধীন জাতি) যে ইংরেজীতে বলব? আমি আমার mother tongue-এ (মাতৃভাষায়) বলবো।

ইংরেজী ভাষা পরের ভাষা। তা'তেও ভারতের লোকের উৎকর্ষ হয়েছে কত! মাতৃভাষা হলে আরও অনেক বেশী হতো। খবর পেলাম দিল্লীতে সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিভ এসেমব্লিতে ইংরেজগুলো জড়সড় হয়ে যায় ভারতীয়দের বলবার শক্তি ও বিচার দক্ষতা দেখে। তাদের ভাষা শিখে সেই অস্ত্রে তাদের হারিয়ে দিচ্ছে। কত শক্তি ভারতের! পুরানো culture-এর (সংস্কৃতির) জোর রয়েছে যে পেছনে। সমস্ত জগৎ ভারতের দিকে চেয়ে আছে (প্রথম) world war-এর (বিশ্বযুদ্ধের) পর।

রবিবাবু অস্ট্রিয়াতে গেলেন। তখন একদল লেডিস্ তাঁকে দেখতে এসেছেন। তাঁরা language (ভাষা) জানেন না। খালি বলছেন, 'We love India' (আমরা ভারতকে ভালবাসি)। এই বলে সগৌরবে নিজেদের introduced (পরিচিত) করলেন।

তা বলবেন না? এ যে সত্য কথা! এঁরা যে সত্যবাদী! এই ভারত highest ideal realise (সর্বোচ্চ আদর্শের দর্শন) করেছে কত যুগ যুগান্তর আগে। Human life-এর (মনুষ্যজীবনের) যত সব problems (সমস্যা) — এ সবই solve (সমাধান) করেছে এদেশ ওদের জন্মের আগে। যুগে যুগে ভগবান এখানে মানুষ হয়ে এসেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তির রাস্তা। শুধু তাই নয়, সেই রাস্তায় উঠিয়ে নিয়ে সুখশান্তির খনি ভগবানে পৌঁছে দিয়েছেন। Touch-

stone (কষ্টিপাথর) এখানে রয়েছে। সকলকেই শেষকালে এখানে আসতে হবে।

একদল ছেলে হয় যারা ভারতের এইসব প্রাচীন culture and civilisation, religion and philosophy (সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন) নিয়ে বের হয়, তা হলে সারা ভারতকে তোলপাড় করতে পারে। শুধু কি তাই — সারা জগৎকে তোলপাড় করতে পারে।

নিজেদের ভাষা চাই। নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে জেনে বুঝে তবে বাইরে যাওয়া।

এই আশুবাবু, কত opposition-এর (বাধার) ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে ইউনিভারসিটিতে বাংলায় এম.এ. করেছেন। তিনি এটা বুঝেছিলেন। বাবুরা oppose (বাধাদান) করেছিল।

এমনও একটা যুগ গেছে কি না এই কলকাতায়। তখন কয়টা passage (রচনার অংশ) শেক্সপীয়রের আর মিলটনের মুখস্থ করে, হাতে ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে মুখে বুলি ঝাড়ছে।

এঁদের কার্যই দেখ না — কালিদাস প্রভৃতির! এঁর কাছে শেক্সপীয়র দাঁড়াতে পারে? এঁর কাব্যেও highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ) প্রকাশ পাচ্ছে। আর কাব্যের আর্ট, তাও কি কম? এদেশের সকল বিষয়েই ঐ highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ) প্রকাশিত হচ্ছে — music, painting and poetry, architecture and sculpture (সঙ্গীত চিত্রকলা আর কবিতা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য), এই সবের ভিতর দিয়ে আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন প্রকটিত হচ্ছে।

কলিকাতা।
১১ই জুলাই, শুক্রবার ১৯২৪ খ্রীঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছেন স্বামীজী

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন রাত্রি আটটা। বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। এখন বৃষ্টি বন্ধ। শ্রীম উত্তরাস্য চেয়ারে বসিয়া আছেন। শচী, শান্তি, সঙ্গী, ছোট রমেশ, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, সুকুমার, বলাই প্রভৃতি আসিয়াছেন। সন্ধ্যার ধ্যান ছাদে বসিয়া হইতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনায় শ্রীম ভক্তসঙ্গে সিঁড়ির ঘরে গিয়া বসিলেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য দরজার পাশে। ভারতীয় সংস্কৃতির কথা হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ কালিদাসের কাব্যকলার উৎকর্ষের কথা উঠিয়াছে। ভারতীয় চিন্তার মুকুটমণি ব্রহ্মদর্শন যেমন উহাতে স্থান পাইয়াছে তেমনি ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক ও লৌকিক চিত্রাঙ্কনও স্থান পাইয়াছে। উচ্চ ভাব, জীবন্ত ভাষা ও রচনানৈপুণ্যের সমাবেশ দেখা যায় কালিদাসের নাটকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কালিদাসের শকুন্তলা জগতে অতুলনীয়। গ্যেটে (Goethe) তাই বলেছিলেন, 'জগতে এমন জিনিস আর হয় নাই।'

আমরা যখন পড়তুম শকুন্তলার পার্টিং সিন্‌টা, পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। জানতুম, এ সব কবিকল্পনাপ্রসূত, তবুও। এমনি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনানৈপুণ্য। এই ভেবে কাঁদতুম মহামায়ার বিচিত্র শক্তি কিভাবে জগৎ পরিচালনা করেন, কি ভাবে আঁকড়িয়ে রেখেছেন সংসারটা। বনবাসী কণ্বমুনিও স্নেহে বদ্ধ সাধারণ মানুষের মত পালিত কন্যার বিরহে কাতর হয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানী কি না, তাই ধরতে পেরেছেন নিজের অবস্থা। বলছেন, 'গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ' — বনবাসী আমারই যদি স্নেহে এ অবস্থা হয়, গৃহস্থদের না জানি কত দুঃখ প্রথম প্রথম কন্যাবিদায়ের সময় হয়! (শচীর প্রতি) পড়তো শ্লোকটা।

শচী (পড়িতেছেন) —

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ।
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথঃ নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

শ্রীম — দেখুন, এখানে শকুন্তলা যখন বলছেন — বাবা, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। অমনি তো তপস্যাজনিত কঠোরতায় আপনার শরীর ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। শমমেষ্যতি মম শোকঃ। তৎক্ষণাৎ কণ্বমুণি উত্তর করলেন, ঠিক সাধারণ মানুষের মত, 'কথং নু বৎসে ত্বয়ারচিতপূর্বং উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ'; কি করে তোমার চিন্তা না করে থাকবো, মা! এই কুটীরদ্বারে তুমি নিজ হাতে ধান রোপণ করেছ। এই গাছগুলি যতদিন দেখতে পাব ততদিন তোমায় কি করে ভুলবো, মা?

শকুন্তলা অধীর হয়ে পড়েছে। তাকে প্রবোধ দিচ্ছেন মুনি। বলছেন, যখন উচ্চ রাজকুলে পাটরাণী হয়ে সংসারের কাজে ভুলে থাকবে, আর সূর্যের মত পুত্র উৎপন্ন করবে, তখন আমাদের জন্য তোমার এই শোক ভুল হয়ে যাবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, কি কথাই বলেছেন। দেখ না, শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মেয়ের কত কান্না। ও মা, এই মেয়েই সব ভুলে যায় যখন সংসারে জড়িয়ে পড়ে ছেলেপুলে নিয়ে। তখন বাপ-মার অসুখের সংবাদ পেলেও এসব ছেড়ে আসতে পারে না। চিঠি লেখে — বাবা, আশ্বিন মাসে স্কুল ছুটি হলে আসবো (সকলের হাস্য)। মহামায়ার জগৎ রক্ষার এইটি অপূর্ব কৌশল। স্নেহ দিয়ে সংসার বেঁধে রেখেছেন। এক স্নেহ ছেড়ে আর এক স্নেহে গিয়ে জড়িয়ে পড়ে।

শ্রীম — এই শ্লোকটিতে পতিকুলে স্ত্রীর কর্তব্য বর্ণনা করেছেন।

শুশ্রূষস্ব গুরুঞ্জুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
পত্যুর্বিপ্রকৃতাঽপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী।
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

পতিকুলের গুরুজনদের সেবা, সপত্নীদের সঙ্গে বন্ধুভাব, পতি রুষ্ট হলেও তাহার সহিত কলহ না করা, পরিজনে দয়া ও দান, আর নিজের সৌভাগ্যে বিনম্রতা — এইগুলি পালন ক'রে যুবতী বধু গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়।

আগে একজনের অনেক স্ত্রী থাকতো, তাই সপত্নীর কথা বলেছেন। এখন ঐ প্রথা প্রায় উঠে গেছে।

অমৃতের প্রবেশ। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। প্রণাম করিতেই শ্রীম কথা বলিলেন।

শ্রীম — শুনুন অমৃতবাবু, কণ্বমুনি শকুন্তলাকে উপদেশ দিচ্ছেন, এখন যাও মা পতিগৃহে। তারপর সংসার ক'রে পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়ে আবার ফিরে এসো এই আশ্রমে পতির সহিত। তখন ঈশ্বরচিন্তায় উভয়ে মনোনিবেশ করবে। বাণপ্রস্থের কথা বলছেন। এইটি ভারতের সনাতন আদর্শ।

শ্রীম আবৃত্তি করিতেছেন —

ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহী সপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন॥

শ্রীম — আর এই শ্লোকটিতে পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাঁশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎসুখিতোঽপিজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

সুন্দর বন্ধু দর্শন ক'রে আর মধুর বাক্য শ্রবণ করে যখন সুখী ব্যক্তির মন উদাস হয় তখন বুঝতে হবে যে, তার পূর্বজন্মের সংস্কার জাগ্রত হয়েছে। এই পুনর্জন্মবাদ, যখন অপর দেশের জন্মও হয় নাই, সেই অতি প্রাচীন কালেও ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এটিও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — এই শ্লোকগুলি মুখস্থ করে রাখবে। মুখস্থ না করলে ভাষা শিক্ষা করা যায় না। আর মননও হয় না আর প্রথম

শ্লোকটিও মুখস্থ করবে।

শ্রীম নিজেই প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন।

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যবহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধতঃ শ্রুতিবিষয়গুণাঃ যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গ্রন্থের প্রথমেই ঈশ্বরবন্দনা — আবার কাব্যগ্রন্থের। এইটিও বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য — সর্বকার্যের প্রারম্ভে ঈশ্বরস্মরণ। পাঠকের মনটি এইটিতে ভগবানে নিয়ে যায়।

জল অগ্নি হোতা সূর্য চন্দ্র আকাশ পৃথিবী আর বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপ — এই আটটি। এইরূপে ভগবান জগতের সকলের কল্যাণ করুন। এইটিও বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য — আগে অপরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, পরে নিজের কল্যাণ।

এ আদর্শ কোথায় পাবেন? শেক্সপীয়রে এসব নেই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ — এই চতুবর্গের মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। মোক্ষ মানে ভগবান-লাভ। এইটি মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শের সঙ্গে যোগ রেখে নিম্নাঙ্গের ভোগের বিধি দিয়েছেন বেদ। এই আদর্শের ব্যবহারিক রূপ 'ধর্ম', মানে সত্যাদি সাধন। সত্যাদিকে অবলম্বন করে 'অর্থ কাম' ভোগ করলে তবে মোক্ষ লাভ হতে পারে। যদি সংসার ভোগ করতে গিয়ে মোক্ষ অর্থাৎ ভগবান ভুল হয়ে যায় সেই ভোগ ত্যাজ্য। এইটি সনাতন আদর্শ গৃহস্থাশ্রমের। এইরূপে সমস্তটি জীবন দিয়ে ঈশ্বরের পূজা আর কোথাও পাওয়া যায় না, এই ভারত ছাড়া।

এইবার শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ছোকরা ভক্ত শচী, শান্তি, শান্তির সঙ্গী, ছোট রমেশ প্রভৃতির সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। শান্তি চৌদ্দ দিন হয় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইয়াছেন।

শ্রীম (বিশাল চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া দুষ্ট হাসির সহিত ভক্তদের প্রতি) — এই সব বিদ্বান লোক দর্শন করুন। খুব লোক এঁরা। মনে করুন, আমাদের মেডিকেল এ্যাডভাইসের (স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শের) দরকার। তখন যাব কোথায়? না, এই সব পণ্ডিত লোকদের কাছেই তো

যেতে হবে (সকলের মুচকি হাস্য)। (শচীকে দেখাইয়া) ইনি ফিলজফি পড়েছেন আবার শকুন্তলা কাব্য। এইসব বিষয়ের, মনে করুন, একজন অথরিটি (অধিকারী)। আমাদের কত help (সাহায্য) হবে এঁরা যখন বড় হবেন। কি বল রমেশবাবু?

ফষ্টি-নষ্টি, হাসি-তামাসা ইয়ার্কি রঙ্গরসের তুফান চলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারের এইটি বৈশিষ্ট্য। এদিকে 'নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে গেল', 'সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন ভাসছে', 'অনন্ত আকাশে জীবরূপে পক্ষী আনন্দে বিহার করছে' — এই সব উচ্চ বেদান্তের কথা একদিকে। অপরদিকে ঐ হাসিতামাসা রঙ্গরস। এই দুইটি বিরুদ্ধ পক্ষের মিলন সম্ভব কি করিয়া? যাঁহাদের আনন্দস্বরূপের সঙ্গে আত্মীয়তা লাভ হইয়াছে, রসস্বরূপকে যাঁহারা আপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বুঝি এইরূপ রসাস্বাদন সম্ভব সর্বত্র, সর্বাবস্থায়!

শ্রীম কিছু দীর্ঘ সময় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখন ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন। ঠাকুর নিজে বলেছেন, 'আমি অবতার'। দেশের এই সঙ্কট সময়ে তাঁর এই আগমন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান — মানুষকে তার নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মানুষ অমৃতের সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এই সম্পর্কটি ধরে রেখে সংসারের যাবতীয় কর্ম কর। এইটি ধরেই ভারত উঠেছিল, আবার এইটি ধরেই এখন আবার উঠবে। এই কথাটিই বলতে এসেছিলেন। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে, এটিও তাঁর মহাবাক্য।

২

বড় রমেশ — প্রিন্সিপাল কামাখ্যাবাবু ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা লিখেছেন।

শ্রীম — হাঁ, ইনি একজন সত্যিকার বড় লোক। সাহেবরা না বললে বুঝি বড় হয় না? কেন এঁকে বড় বলা হচ্ছে? না, এঁর ideal (আদর্শ) কত বড়! সর্বদা ঠাকুর স্বামীজীকে ভাবছেন। ইনি সামান্য লোক নন — অন্য সব প্রফেসার থেকে অনেক উঁচুতে এঁর স্থান। 'A man is known by the ideal he worships' (মানুষকে চেনা যায়

তার আদর্শ দেখে)। আমরা এঁকে বড় বলছি ঠাকুরের স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে মেপে। বৈদিক স্ট্যাণ্ডার্ড যা, ঠাকুরেরও তাই। বেদে আত্মজ্ঞ পুরুষকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তা হলেই হল যে আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করছে, সে অপরের চাইতে আরো বড়। যে আত্মচিন্তন করছে, যে আত্মজ্ঞের চিন্তা করছে, সেও বড়।

হ্যাঁ, একটা সময় ছিল যখন ওয়েস্টের সাহেবরা বড় না বললে, এদেশের লোক কাউকে বড় বলতো না। স্বামীজী সে hypnotism (মোহনিদ্রা) ভেঙ্গে দিয়েছেন এক ধাক্কায় আমেরিকার পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ানস্-এ। স্বামীজীকে যখন ওঁরা বড় বলে গ্রহণ করলেন তখন এ দেশের সকলে উহা গ্রহণ করলে। স্বামীজী এ কথা নিজে আমাদের বলেছিলেন, 'আমাকে এ দেশে কেউ চিনলে না। ওরা যখন আমাকে পুজো করতে লাগলো তখন এদেশে সকলে মানলো আর আনন্দে হৈ চৈ করতে লাগলো আমাকে নিয়ে।'

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ডিগ্রি নাই বা হ'লো। পড়লে, বিদ্যা লাভ হ'লে, real culture (সত্যিকার কৃষ্টিলাভ) হলে তখন সকলে মানবে — মানতে বাধ্য। বস্তুর গুণ যাবে কোথায়? অসত্য সত্যকে দাবিয়ে রাখতে পারে কিছুক্ষণ। তারপর সত্যের জয় নিশ্চয়। এসব experiment (পরীক্ষা) এদেশে অনেক হয়েছে। তাই শেষে ঋষিরা বলছেন, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' (মুন্ডক ৩:১:৬)।

বিদ্যা থাকলে আঁধার ঘরে বসে থাকলেও তার প্রকাশ হবে। ঠাকুর বলেছিলেন, বনে কমল ফুটলে তার সৌরভে মধুমক্ষিকা আপনিই আসে। নিমন্ত্রণ দিয়ে আনতে হয় না। আসল হওয়া চাই। এখন মানছে না, আসল হলে দু'দিন পরে মানতে বাধ্য।

(একজনের প্রতি) পড় পড়, সর্বদা পড় — higher minds-দের (উচ্চচিন্তাশীল লোকদের) সঙ্গে লেগে থাক। পড়, আর highest idea-র (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের) অর্থাৎ ঠাকুরের সঙ্গে, মিলিয়ে নাও। তাহলে আর confused (বিভ্রান্ত) হবে না।

যে বিদ্যার স্থান যেখানে সেখানে তাকে রাখবে। ব্রহ্মবিদ্যার স্থান সকলের উপরে। এইটি highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ)। এইটির

সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। এটিকে সেন্টার করে পড়লে অপর সকল বিদ্যার উপযুক্ত দাম দিতে পারবে। ব্রহ্মবিদ্যার দাম লাখ টাকা। এইটে নজরে না থাকলে লোক বলে মানিকের দাম ন' সের ব্যাগুন, নয়তো ন' শ' টাকা।

আর দ্বিতীয়, যারা যা পড়েছে, চিন্তা করেছে তাদের সঙ্গ করা, তাদের মুখে শোনা। তা হলে অল্প সময়ে বেশী জানা যায়।

মাপকাঠি তো পাওয়া গেছে — ভগবানলাভ সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ-টি সামনে রেখে পড়। শীঘ্র পণ্ডিত হয়ে যাবে। একেই বলে 'তদর্থে' কাজ। তাঁর জন্য পড়া — তাঁর দর্শনের জন্য। ঠাকুর বলতেন, আম খেতে এসেছ, আম খাও। অতশত গাছপালা গুণে লাভ কি? প্রকৃতিতে কাজ আছে। তাঁকে স্মরণ ক'রে তা কর। সর্বদা মনে রাখতে হবে — পড়ছি, শুনছি, কাজ করছি তাঁকে লাভ করার জন্য। তা হলে নিজেকে না হারিয়ে কেবল মধু সংগ্রহ করতে পারবে। আর ফুলেরও বর্ণ এবং সৌন্দর্য নষ্ট হবে না। 'কুলটি' খাওয়া চাই।

আদর্শটি সামনে ধরা না থাকলে সব জড়িয়ে যায়, সব ভুলে যায়। একটা বিদ্যালাভ করে তাতেই আটকে গেল। ব্রহ্মবিদ্যা আর লাভ হলো না। অল্প সময়ে অনেক বিদ্যা লাভ হয় উদ্দেশ্য মনে থাকলে। উদ্দেশ্য, ঈশ্বরলাভ। এটা birth-right (জন্মগত অধিকার) মানুষের। মানুষ মানে, পশু, মানুষ, দেবতা। এই পশুমানুষই একদিন দেবমানব হবে।

বিদ্যা সহায়। তা দিয়ে বিচার চলে — এই কাজটা পশুত্বে নিয়ে যাবে, কি দেবত্বে। পশুত্বের কাজ ছেড়ে দেবত্বে যাওয়া। আহার, বিশ্রাম, মৈথুন, ভয় — এগুলি পশুত্বের কাজ। মনুষ্যত্বের কাজ, নিজে বাঁচ আর অপরকে বাঁচতে সহায়তা কর — Live and let live. পশু কেবল নিজে বাঁচে অপর সকলকে মেরে। আর মানুষ নিজেও বাঁচে আর অপরকেও বাঁচায়। আর দেবমানব নিজেকে মেরেও অপরকে বাঁচায়।

এই দেবত্ব লাভেরই উপায় নিষ্কাম কর্ম। সেটা পরার্থে কর, কি ঈশ্বরার্থে কর, দেবতা হবে। অর্থাৎ, আমি অমৃত বা অমৃতের পুত্র, এ জ্ঞান ফিরে পাবে। স্বরূপ তো এই মানুষের, কিন্তু মহামায়া ভুলিয়ে দিছলেন। তাঁর কৃপায় লুপ্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হবে।

কেবল নিজের জন্য পড়, নিজের জন্য কাজ কর, তাতে পশু হবে। অনেকে বলে আমাদের আদর্শ মনুষ্যত্ব — আদর্শ মানুষ হওয়া। কিন্তু নিজের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকলে মনুষ্যত্ব থেকেও ভ্রষ্ট হয়ে যায়, নিচে নেবে যায়, পশুত্বে।

মহামায়া সর্বদা ভুলিয়ে দেন, পশুত্বে নাবিয়ে দেন, তাঁর সৃষ্টি রক্ষার জন্য। দুই একটাকে কেবল ছেড়ে দেন দেবত্বে যেতে। ঠাকুর তাই সর্বদা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'। এই প্রার্থনাটি, আর নিজের চেষ্টা — দেবত্বে যাবার এই মাত্র উপায়।

পাশেই বকর্-ঈদের বাজনা বাজিতেছে। শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া উহা শুনিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐ শুনুন, ভগবানকে নিয়ে কেমন আনন্দ করছে তাঁর মুসলমান ভক্তরা। ঠাকুর এক সময়ে মুসলমান ভক্ত সেজেছিলেন। তখন পাঁচবার নামাজ পড়তেন, লুঙ্গি পরতেন, আর সানকিতে খেতেন। দেবদেবীর ছবি দেখতেন না। মা কালীর ঘরেও যেতেন না। একটি বাবুর্চি রেঁধে দিতো। মথুরবাবু কৌশলে একটি ব্রাহ্মণকে বাবুর্চির পোশাক পরিয়ে দিছলেন। ঠাকুর মুসলমানদের খুব মান্য দিতেন — তাদের নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্য। যেখানেই থাকুক নামাজের সময় এলে তারা নামাজ পড়বেই। তা রাস্তায়ই চলুক, গাড়ীই হাঁকাক, কিংবা রাজগদীতেই বসুক — নামাজের সময় সব ছেড়ে নামাজ পড়বেই।

শ্রীম আবার চুপ করিয়া আছেন। দীর্ঘকাল পরে আপন মনে কথা কহিতেছেন — তাঁর কৃপায় এক এক জন কত বড় হয়েছেন, কেউ কেউ জগৎগুরুর আসনে বসেছেন। তাঁর কৃপাই সার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন না, তাঁর ইচ্ছায় কি না হয়। এই তারক মহারাজকে জগৎগুরুর আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। তারক মহারাজ নিজে কখনও তা চান নাই — ভাবেনও নাই। সামান্য কাজ করতেন, কুড়ি পঁচিশ টাকা হয়তো মাইনে হবে, ম্যাকেনজীর আপিসে। কেন নিলেন এই কাজটি? না, তা হলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতে পারবেন। বিয়ে করেছিলেন। রাখাল মহারাজও বিয়ে করেছিলেন। তাঁর

একটি ছেলেও হয়েছিল। যোগেন মহারাজও বিয়ে করেছিলেন। তারক মহারাজ শেষে কাজ ছেড়ে দিলেন। রামবাবুর বাড়িতে থাকতেন। নিত্যগোপালের সঙ্গে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। খুব বেশী নয়। আমরা ভাবতুম নিত্যগোপালের companion (সহচর)। খুব সামান্যভাবে থাকতেন, খুব বৈরাগ্য। তারপর ঠাকুরের অসুখের সময় এসে কাশীপুর থাকতে লাগলেন। তখনও উপরে বেশী যেতেন না — কখন কখন যেতেন। ময়লা কাপড় পরা, বাইরে দেখতে যেন vagabond (ভবঘুরে)। কিন্তু ভিতরে তীব্র বৈরাগ্য।

ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পনের দিনের মধ্যে মা বৃন্দাবনে গেলেন। যোগানন্দ নিয়ে গেলেন। সঙ্গে তারক ও কালী ছিলেন। আমাদের গিন্নীও (শ্রীম-র ধর্মপত্নী) মায়ের সঙ্গে ছিলেন। তারক মাসখানেকের মধ্যে ফিরে এলেন। তারপর বরাবর বরানগর ও আলমবাজার মঠে ছিলেন।

ওঁর বরাবর তপস্যাটি ছিল। ইনি খুব humble way-তে (দীনহীনভাবে) থাকতেন। কখনও চেষ্টাও ছিল না বড় হওয়ার। কখনও কল্পনাও করেন নাই। ওমা, সকলে ঠিক করে একেবারে হেড্ করে বসিয়ে দিলেন মঠ ও মিশনের। কথায় বলে, রাজহস্তী যাকে পিঠে তুলে নেয় সে-ই রাজা হয়। বেদে আছে, 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি।' (চন্ডী — দেবী সূক্ত)

মর্টন স্কুল, ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।
১১ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৭শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল, শুক্রবার।
শুক্লা নবমী ৭।৩৪ পল।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবন্মুক্তি বিদেহমুক্তির দৃষ্টান্ত ঠাকুর

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। ডিসেম্বর মাস। এখন সকাল আটটা। শ্রীম দোরগোড়ায় চেয়ারে উপবিষ্ট। গায়ে সোয়েটার, তাহার উপর একটি বালাপোষ জড়ানো। বাঁ পাশে বেঞ্চে বসা অন্তেবাসী, বিনয় ও ছোট জিতেন। দুই চারিটি কথা হইতেছে, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যসূচক। ভক্তরা সাধুসঙ্গ করেন, বেলুড় মঠে যান, কখনও দক্ষিণেশ্বর। শ্রীম বলিতেছেন, এটি ছাড়বেন না। এটি ধরে থাকলে ঈশ্বর, মায়া, ব্রহ্ম, জগৎ, বন্ধ, মোক্ষ — ধর্মজগতের সকল তত্ত্ব বোঝা যাবে। ভিতর থেকে আলো আসবে। ঐ আলোতে এ সকলের রূপ দেখা যাবে। তা' হলে অত পড়তে হবে না শাস্ত্রাদি। এই সাধুসঙ্গতেই ঠাকুরের রূপটি কি — এটি দেখতে পাওয়া যাবে। হাজার বই-ই পড়, আর তপস্যাই কর, সাধুসঙ্গ না হলে ঠিক তত্ত্ববোধ হয় না, ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা হয় না।

এই সব কথা হইতেছে। দুইজন নূতন ভক্তের প্রবেশ। তাঁহারাও শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বেঞ্চে বসিলেন। কথা হইতেছে।

একজন ভক্ত — আমাদের ওখানে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ চলছে। মাঝে মাঝে যাই শুনতে। কাল পাঠ হচ্ছিল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির কথা। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। আমরা ঠাকুরের ভক্ত, কথামৃত পড়ি।

শ্রীম — এসব পড়ে বা শুনে বোঝা যায় না। তপস্যা করলে কতকটা বোধ হয়। সাধন চাই।

আর সর্বদা ঠাকুরের জীবন ও বাণী — এসব চিন্তা করতে হয়। তবে বোঝা যায়। কেবল পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় ও শাস্ত্রপাঠে কিছু হয় না।

ঠাকুরের সারাটা জীবনই মুক্ত অবস্থা — কখনও বিদেহমুক্ত অবস্থাতে অবস্থান, কখনও জীবন্মুক্ত। একই অবস্থা, কথা দু'টো। দিবানিশি —

জাগরণে, শয়নে স্বপনে, জগদম্বাকে দেখছেন। নামরূপ জগৎ রয়েছে সামনে, কিন্তু ওতে অভিনিবেশ নাই। মানুষের ভিতর অন্তর্যামী পুরুষকে দেখছেন — স্থূল সূক্ষ্ম কারণে নামমাত্র মন। বাচ খেলা যেন। একটু নিচে এল, অমনি আবার হুট করে উপরে উঠে গেল।

বাইরে থেকে দেখা যায় দু'টো অবস্থা, ভিতর থেকে দেখলে একটা। দেহ থাকতে মুক্তি, দেহত্যাগের পর মুক্তি। বেদের সৃষ্টি হয় জীবন্মুক্তাবস্থায়।

ঐ অবস্থাতে কি করে আচরণ হয় তার কথা গীতায় রয়েছে। কখন স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা বলা হয়েছে, কখনও ত্রিগুণাতীত। এ সবই একই কথা। সবই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। জীবিতাবস্থায়ও মুক্ত। অন্য লোক জীবিতাবস্থায় বদ্ধ — মায়ামোহে, অহংকারে, কর্তৃত্ববুদ্ধিতে। সুষুপ্তিতে মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। তখন রাগ দ্বেষ থাকে না। যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, ঐতে ডুবে আছেন, জাগ্রত অবস্থাতে তিনি সুষুপ্তির মত রাগ দ্বেষ, অহংকার, কর্তৃত্ববোধ বিবর্জিত। জনক রাজ্য শাসন করছেন, শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাচ্ছেন। কিন্তু, তাঁরা বিচ্যুত নন ব্রহ্মাত্মভাব থেকে। একই জ্ঞান জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে।

ঠাকুর কখনও ব্রহ্মসমুদ্রে ডুবে যেতেন। কোনও হুঁশ নাই, যেন মৃতবৎ। এও মুক্তাবস্থা, এখানে দেহজ্ঞানের লেশও নাই। একে বলা হয় বিদেহ মুক্তাবস্থা — দেহজ্ঞান সম্পূর্ণ বিবর্জিত। ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন। এক দুই জ্ঞানের পার।

ভক্ত — যদি দেহজ্ঞানের লেশ থাকে, তবে মুক্তাবস্থা বলা যায় কি করে?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, এ যেন পোড়া দড়ি, যেন সোনার তরোয়াল। যেন পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে থাকা। এতে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নাই। ঐ অবস্থায় কি ক'রে কাজ করে? তার কথা গীতায় আছে — 'ইন্দ্রিয়াণি, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত — ইতি ধারয়ন্' (গীতা ৫:৯)। মহাকারণে অবস্থান। যেখান থেকে নিজের ভিতরই দেখেন আরও তিনটি মানুষ — স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, এই যেমন আমরা আপনারা দুইজন আর এঁকে (জিতেনকে) দেখছি।

এই জীবন্মুক্ত অবস্থাই যখন খুব গাঢ় হয় — ঘনীভূত হয়, ঠাকুর বলতেন, ন্যাবা লাগা — সব হল্‌দে দেখে তখন, যখন খালি ঈশ্বরকে

দেখে, সেই অবস্থাই বিদেহ মুক্তাবস্থা। তখন 'কৃষ্ণময়ং জগৎ'। গোপীরা সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করতেন রাসলীলায় — নিজেদের পর্যন্ত।

এই দুই অবস্থা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি ভক্তিপথেও লাভ হয়, জ্ঞানপথেও লাভ হয়। ঠাকুর একবার জ্ঞানপথে, নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্মে লীন হয়ে ছিলেন ছ'মাস। সাকার নিরাকার দুই পথেই হয়। Intensity-র (তীব্রতার) তারতম্য। নিত্য আর লীলা। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আর সচ্চিদানন্দময়। দুই অবস্থাতেই জগতের জ্ঞান নাই — ব্রহ্মের জ্ঞান কেবল — কখনও সাকার সগুণ, কখনও নিরাকার নির্গুণ — আবার কখনও নিরাকার সগুণ।

ভক্ত — আপনার কথা শুনে, ঠাকুরের জীবন দেখিয়ে দেওয়ায় কতকটা বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে। ওরা যখন যোগাবাশিষ্ঠ পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন তখন শুষ্ক মনে হয়, বুদ্ধিকে যেন লাঠি মারে। এখানে তো দেখছি বেশ সরল সবল সাবলীল।

শ্রীম — এতে আমাদের বাহাদুরী নাই। যাঁর জীবনই ছিল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির জীবন্ত ও জ্বলন্ত উদাহরণ, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছিলাম। চোখে দেখে, কানে তাঁর কথা শুনে, বলছি। কেবল বিচারে বেদান্ত বোঝা যায় না। অনুভূতি চাই। এ করতে হলে সাধন চাই। আর যার এই সব অবস্থা হয় তাঁকে দেখলে তো কথাই নাই শাস্ত্রের সদর্থ প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হ'য়ে এসেছেন। সর্বদাই আসেন যখন কদর্য হয়ে যায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। ভাগ্যিস্ ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি পাঁচ বছর, তাই এসবের একটু একটু বুঝতে পেরেছি। 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্', — ছান্দোগ্য (৬:১:৪) উপনিষদের এই মন্ত্রটি বিদেহমুক্তির দৃষ্টান্ত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের ভক্তদের জীবনও এইসব তত্ত্বের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এঁদের জীবনেও এই সব সত্য সর্বদা প্রকাশিত। সারাটা জীবন দিয়ে এই সব প্রকাশিত হচ্ছে। হাতের কাছে পায় বলে মনে করে এঁদের জীবন তো দেখছি অন্য মানুষেরই মত। কিন্তু তা' নয় — ব্রহ্মজ্ঞানের টাট্‌কা পুর এঁদের ভিতর।

ভক্ত — তবে আর এসব শাস্ত্র পড়ে কেন অযথা মাথা ব্যথা করা?

শ্রীম — আগে ঠাকুর ও তাঁর পার্ষদদের জীবনের অনুশীলন চাই। তারপর শাস্ত্র পড়ায় দোষ নাই। তখন অর্থ সহজে বোধ হয়। তখন মনে হবে, 'নদীর ধারে বসত করে জল পিপাসায় মরিস্ কেন?' — এর যথার্থ অর্থ।

সঙ্গী ভক্ত — ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানমার্গের লোক নাই।

শ্রীম — কি করে জানলেন? স্বামীজী কি? ঠাকুর বলতেন, তাঁকে দেখলে মন অখণ্ডের ঘরে লীন হয়ে যায় — সপ্তর্ষির এক ঋষি। ঠাকুরের কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। জ্ঞানপথের শ্রেষ্ঠ অবস্থা, স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধির গানটি পড়বেন। ঠাকুর একবার ছয়মাস ঐ নির্বিকল্পে ডুবে ছিলেন একটানা। তখন ঘর থেকে দেবদেবীর ছবি বের ক'রে দিয়েছিলেন। তোতাপুরী যা চল্লিশ বৎসরে লাভ করেন, ঠাকুর তা' তিনদিনে লাভ করেন। তোতাপুরী অবাক হয়ে বলতেন, 'এ ক্যায়া রে'। তোতাপুরী শেষে চিনেছিলেন, অবতার বলে। ঠাকুর মহিম চক্রবর্তীকে একদিন বলেছিলেন এই কথা। বলেছিলেন, ন্যাংটা জানতো এর মধ্যে কে আছে। আমার বাবাও জানতেন, এর ভিতর কে।

সঙ্গী ভক্ত — আমার বলার উদ্দেশ্য, প্রাচীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে জ্ঞানমার্গের আচরণ যেরূপ দেখা যায়, এ সম্প্রদায়ে এরূপ দেখা যায় না।

শ্রীম — যুগের প্রয়োজনে method (প্রণালী) বদলে যায়। এক এক অবতার এসে এক এক রকম চালান। এখন জগতে সমন্বয়ের দরকার। তাই এখন এর উপর emphasis (জোর) দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর ভক্তরা অনেকেই সেই নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। বাইরে কেহ ভক্তি নিয়ে আছেন, কেহ লোকশিক্ষার্থ কর্ম, এই সব নিয়ে আছেন।

সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। এখন ঐরূপ একঘেয়ে সম্প্রদায়ের দরকার নাই। প্রহ্লাদের জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই ছিল। হনুমানেরও তাই। চৈতন্যদেবের বাইরে ভক্তি, ভিতরে জ্ঞান। ঠাকুরেরও তাই — বাইরে মায়ের ছেলে, ভিতরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। যোগবাশিষ্ঠে যেমন রামের জ্ঞানবিচারের কথা আছে, তেমনি অধ্যাত্ম রামায়ণে জ্ঞানভক্তির কথা

রয়েছে।

তারপর ঠাকুর বলতেন, এখন লোকের মন চঞ্চল। আয়ু কম। অন্নগত প্রাণ। তাই জ্ঞানপথে চলা কঠিন। তা' বলে তাঁর সম্প্রদায়ে জ্ঞানমার্গের লোক নাই এ কথা বলা যায় না। কালে হয়তো ঐরূপ একটা দল চলতে পারে প্রয়োজন হ'লে। হয়তো আবার এসে ঐ পথের উপর জোর দিবেন।

বৌদ্ধমতে জ্ঞানমার্গের উপর জোর ছিল। শঙ্কর তাই ওদের জ্ঞান বিচার নিয়ে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন — ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বৌদ্ধরা জগৎ মিথ্যার উপবজোর দিয়েছেন। শংকর ব্রহ্মের উপর জোর দেন — 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' ঠাকুরে এই দুই-ই আছে। স্বামীজী তাই মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম করলেন ওয়েস্টের জ্ঞানমার্গীদের জন্য। ওখানে দ্বৈত ভাবের পূজাদি নাই। তারপর স্বামীজীকে দিয়ে ঠাকুর জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এ সবই প্রচার করিয়েছেন। ঠাকুরের ভক্তরা কেহ কেহ ভক্তিপথ দিয়ে জ্ঞানপথে গেছেন। কেহ বা জ্ঞানপথ দিয়ে গিয়ে পরে ভক্তিপথে গেছেন।

ঠাকুর বলতেন, যার যা পেটে সয় সেই পথে সে যাবে। দণ্ডকারণ্যে ষাট হাজার ঋষির ভাব ছিল জ্ঞানের সংস্কার। তাঁরা বলেছিলেন — রাম, তোমাকে ভরদ্বাজাদি সচ্চিদানন্দের অবতার বলেন। আমরা কেবল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপাসক। ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে একজন ভক্ত ঋষিদের উপর কটাক্ষ করেছিলেন। ঠাকুর তীব্র protest (আপত্তি) করলেন। বললেন, 'আপনি এমন কথা বলো না। যার যা পেটে সয় সে তাই করবে।' তা করবেন না? তিনি যে উভয় পথে সিদ্ধ — সিদ্ধের সিদ্ধ!

ঠাকুর ভক্তদের নিরাকারের সাধনাও করিয়েছিলেন। একজনকে (শ্রীমকে) মতিশীলের ঝিলে নিয়ে গিছলেন — নিরাকারের ধ্যানের উদাহরণ শেখাতে। স্থির শান্ত জলে স্বচ্ছন্দে মীন বিচরণ করছে। আবার অষ্টাবক্র-সংহিতা পড়তে বলেছিলেন। এই গ্রন্থের সাধনও শিখিয়েছিলেন। আবার সেই ভক্তকে শুদ্ধাভক্তিও শিখিয়েছিলেন, সাধন করিয়েছিলেন। অবতারে সব পথের সাধন রয়েছে, সাধকও রয়েছে।

ভক্তরা বিদায় লইলেন। শ্রীম বলিলেন, ঠাকুরকে চিন্তা করলে সব সংশয় দূর হবে। একটা পথ ধরে অগ্রসর হওয়া চাই। এই কথা তিনি বলেছিলেন। কিছু কাজ করা — কেবল বিচারে চিঁড়া ভিজে না।

এখন সাড়ে নয়টা।

২

এখন রাত্রি প্রায় আটটা। শীত পড়িয়াছে, ডিসেম্বর মাস। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। সামনে ও বাঁ দিকে ভক্তরা বসা — বড় জিতেন, রমণী, ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, বলাই, মনোরঞ্জন, ব্রুকবণ্ড (যতীন), শান্তি প্রভৃতি। আসামের অক্ষয় ডাক্তারও আসিয়াছেন।

জগবন্ধু থিওজফিক্যাল সোসাইটি হইতে ফিরিয়াছেন। ফিরিবার পথে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রচারক ভাই কালীনাথের স্মৃতিসভায় তাঁহার গুণগান করিতেছেন ব্রাহ্ম ভক্তগণ। থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে কুলদা মল্লিক বক্তৃতা করিয়াছেন। বিষয়, 'ভিখারী ভগবান'। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কথা। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কাছে প্রেমভিক্ষা করিতেছেন। প্রেমের গুরু শ্রীরাধা।

গোপীগণ তনমনধন দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন। জগতে এ ভালবাসা নাই। শ্রীরাধা কৃষ্ণসুখে সুখী। তাঁহার স্বতন্ত্র সুখ নাই। কৃষ্ণের ভালতে ভাল, কৃষ্ণগত মনপ্রাণ।

শ্রীম জগবন্ধুর নিকট হইতে এই সব কথা শুনিলেন। এইবার তিনি কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সংসারের মানুষ কি করে এসব কথা বোঝে, বল? এখানে লেনদেনের স্থান — give and take, কিছু না চেয়ে সব দেওয়া এ বস্তু এখানকার নয় — খালি আছে বৃন্দাবনে। মানে, ঈশ্বরের কাছে।

কেন তিনি করেন এসব লীলা? এরও উত্তর, এসব না করলে সংসার নিতান্তই জ্বলন্ত অনল হয়ে যাবে — মরুময় হয়ে যাবে। তাই এসব লীলা করেন। গোপীও তিনি, কৃষ্ণও তিনি। বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ ভাব খালি 'give' (দাও) — 'not take' — নিও না কিছু প্রতিদানে।

এটি ঈশ্বর। আর মানুষের স্বভাব — প্রাকৃত মানুষ — খালি জানে

নিতে। যেমন পশুর স্বভাব, খালি নেয়। মাঝের অবস্থা, দেওয়া নেওয়া — give and take. এতে চলে সংসার। দুটো extremes, আগাগোড়া বাদ দিয়ে চলে সংসার। ঠাকুর বলতেন, খাঁটি সোনায় গড়ন হয় না। খাদ চাই। যেমন বৃন্দাবনলীলা তেমনি তার উল্টো পশুলীলা। এ দুটোর মিশ্রণে সংসার — লেনদেন।

তাই ভগবান প্রেমভিখারী গোপীদের কাছে, শ্রীরাধা হলেন প্রেমের গুরু। ভগবান গোপীদের দুয়ারে ভিখারী — প্রেমের ভিখারী। সংসারের কোন জিনিস চান না — চান কেবল ঈশ্বরে ভালবাসা, প্রেম। ভগবানও এটা চান, ভক্তও, গোপীও এটা চান। গোপীকৃষ্ণ না থাকলে সংসার কেবল পশুস্থান হয়ে যেতো। পশু খালি চায়, সংসারের নাশবান পদার্থ, স্বার্থ কেবল। নিঃস্বার্থ শিক্ষা দিতে আসেন ভগবান অবতার হয়ে। গোপীও নিঃস্বার্থ, কৃষ্ণও নিঃস্বার্থ। স্বার্থপরতাময় সংসারে এই নিঃস্বার্থ আছে বলে, গোপী ও কৃষ্ণ, ভক্ত ও ভগবান, এই সংসার বাসযোগ্য।

ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা মানুষজন্ম নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করতে চান। কেন? না, এখানে অন্তরে বাহিরে প্রেমের খেলা।

চৈতন্যদেব ও ঠাকুর উভয়েই ভিখারী ভগবান। কিছুই চান না, খালি প্রেম চান। উভয়েই প্রেমের কাঙ্গাল। চৈতন্যদেব গম্ভীরায় পড়ে আছেন মহাভাবে। জগৎ ভুল হয়ে গেছে, দেহজ্ঞান শূন্য। নিচে এলে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে পাগল।

ঠাকুরের অবস্থাও তাই। গায়ে কাপড়খানা পর্যন্ত রাখতে পারেন নাই — মা মা করে জগৎ ভুল হয়ে গেছে। রাত্রে শুয়েছেন, শ্বাসে-প্রশ্বাসে মা, মা। কখনও উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চেঁচিয়ে উঠছেন, যেন শিশু — মা ছাড়া থাকতে পারে না।

কিছুই চাই না, চাই কেবল মাকে। সংসারে যদি এই চ্যালেঞ্জ না থাকতো, সংসার হ'তো পশুস্থান।

সকলে পাগল কামিনীকাঞ্চনে, ঠাকুর পাগল মায়ের প্রেমে। এই দুই টানের মাঝে থাকে ভক্তগণ। ভক্তগণ মিলনসূত্র — সংসার ও ঈশ্বরের। ভক্তরাই সংসারে রসসঞ্চার করে — তবে চলে সংসার, তবে হয় এ স্থান liveable, বাসযোগ্য।

৩

শ্রীম-র হাতে কথামৃতের প্রুফ। চতুর্থ ভাগ। পঞ্চদশ খণ্ড। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ, ৩রা জুলাই — ঠাকুরের বলরাম-মন্দিরে উল্টোরথে শুভাগমন। পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তা হইতেছে। শ্রীম-র আদেশে শান্তি পড়িতেছেন। শ্রীম মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অবতার না এলে ধর্মের গোঁড়ামি কায়েম হয়ে বসে। Clot (জমাট) বেঁধে যায়।

তাই বলরামবাবুর পিতাকে লক্ষ্য করে ধর্মের উদার ভাবের কথা বলিতেছেন। তিনি আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব।

শ্রীম — একদিকে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা — অপর দিকে ধর্ম-সমন্বয়। ঠাকুর এসেছেন এই সমন্বয়ের জন্য। তাই তাঁর সাধন সর্বধর্ম-সমন্বয়। খ্রীস্টান, মুসলমান ধর্ম পর্যন্ত সাধন করলেন। কেন করলেন অত সব? তিনি জানতেন সায়েন্সের প্রভাবে সমস্ত জগৎ এক হয়ে যাবে — যেন এক পরিবার। মানুষের শান্তিসুখের আকর ভগবান। কেবল তাঁকে ধরে মানুষের মিলন-মন্দির সংগঠিত হবে। মূলে এক, বাইরে বহু। জগৎকে বলে গেলেন, বৃথা ঝগড়া। সকলই এক পিতামাতার সন্তান। যে যেমন ভাবে পিতাকে ডাকে তাকে তেমনি ভাবে ডাকতে দাও। তুমি তোমার পথ বেছে নাও। অপরকে তার পথে চলতে দাও। মনে রাখবে, সকলই এক পিতামাতার সন্তান। তা হলে বিবাদ কম হবে। বিবাদ হবেই। জগতের স্বভাবই এই। বোন-ভাইয়ে ঝগড়া হয়। তখন মা বাপ এসে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। জগতেও তাই। ঝগড়া যখন খুব বাড়ে তখন কলি, প্রেম যখন বাড়ে তখন সত্য যুগ — মাঝে ত্রেতা ও দ্বাপর। এই চক্র চলছে অনন্তকাল। মাঝে মাঝে এসে ভগবান মানুষের ভিতর এই প্রেমভাব জাগ্রত করে যান। এই জন্যই ঠাকুরের আগমন। সমন্বয়-আচার্য ঠাকুর।

পাঠ চলিতেছে। পরমহংসের অবস্থা ঠাকুর বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অত করে নিজেকে প্রচার করছেন অবতার বলে, তবুও ভক্তরা ধরতে পারছে না। এক একবার ধরলো, আবার সংস্কার এসে ছাড়িয়ে দিলে। তিনি ধরা না দিলে কার সাধ্য ধরে!

বলছেন, পরমহংস সব ব্রহ্মময় দেখে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায়

চলছে, হিসাব নেই। তাঁর ভয় নাই। সর্বত্র দেখছে ভগবানকে, সবই ভগবান। তিনিই জগৎরূপ ধারণ করে আছেন। মানুষ দেখে জগৎকে — পরমহংস, অবতার দেখেন ভগবানকে। Attention (মনোযোগ) দুজনের দুটোতে। অবতারের কাছে জগৎ ও ব্রহ্ম, এই দুটোর difference (প্রভেদ) vanish (অন্তর্হিত) হয়ে গেছে জাগ্রত অবস্থাতেই। মাঝখানে অতি সূক্ষ্ম একটি আবরণ থাকে যেন কাঁচের, যেন ঢাকাই মস্‌লিনের।

পাঠ চলিতেছে। ঠাকুর শ্রীমকে বলিতেছেন, সাধ্য-সাধনার দরকার। শুধু পাণ্ডিত্যে চলে না। বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। বলছেন, গৌরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শাস্ত্রী সাধনা করতেন। তাই তাঁদের ভালবাসতেন।

শ্রীম (স্বগত) — কি আশ্চর্য! মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত বড় লোক! উনি আমার একজন 'হিরো' ছিলেন ছেলেবেলায়! কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না ঠাকুর। বলছেন, কে যেন আমার জিভ টেনে ধরছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তিনি কি মাইকেলকে নিন্দা করলেন? তা' নয়। একটা উচ্চ আদর্শ দেখালেন। এঁরা সংসারের সব বুদ্ধি নিয়ে বড়। তাকে ঠাকুর বলতেন 'চিঁড়াভেজা বুদ্ধি'। আর ঠাকুর হলেন ব্রহ্মধনে ধনী। আলোচনার common point (সাধারণ বিষয়) নাই। একজনের জীবনের আদর্শ — কামিনীকাঞ্চন, আর এক জনের — ঈশ্বর। ঈশ্বরের কথা বললে ও বুঝবে কেন? বিকারের রোগী প্রবোধ মানে না।

একজন ভক্ত — ঠাকুর বলছেন, যাকে দশ জনে মানে গণে তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। মাইকেলের ভিতর তো ঈশ্বরের শক্তি। অত বড় কবি, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক। তবে ঠাকুর কেন কথা কইলেন না এঁর সঙ্গে?

শ্রীম — হাঁ, শক্তিবিশেষ বটে, তবে অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তির কথা বললে ও শুনবে না। নেশা কমলে, তখন হিতবচন শোনে। নইলে বলে, বেশ আছি বাবা। তাই তো গীতায় বলেছেন অর্জুনকে, আমার এই সব কথা সকলকে বলবে না। যে ঈশ্বরকে মানে, গুরুসেবা করেছে, সে-ই শোনার অধিকারী।

নারায়ণ শাস্ত্রীকে বললেন কিনা মাইকেল, 'পেটের জন্য খ্রীস্টান ধর্ম নিয়েছি ধর্মের জন্য নয়, ঈশ্বরলাভের জন্য নয়'। তাতেই মনে হয়, ঠাকুর

কথা কইতে পারলেন না। হিন্দুধর্ম ছেড়ে ঈশ্বরলাভের জন্য যদি খ্রীস্টান ধর্ম নিতেন, যদি ঈশ্বরের জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন, তা হলে কথা কইতে পারতেন। মিশির সাহেবও খ্রীস্টান ধর্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কত কথা, কত ভালবাসা। তাঁকে ঈশ্বর-দর্শন করালেন ঠাকুর ঈশামসিরূপে। মিশির সাহেব কালীঘরে প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখলেন ক্রাইস্ট — মা কালী ক্রাইস্ট। পরে বুঝলেন, ঠাকুরই ক্রাইস্ট।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আসিয়াছেন, সঙ্গে দুইজন সঙ্গী। ঠাকুর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এসব বই পড়ে বলেন নাই , যেমন পণ্ডিতরা বলে। এসব অবস্থা তাঁর নিজের হয়েছে।

জ্ঞানীর স্বভাব প্রশান্ত ও নিরভিমান। আবার কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য, সাধু ভক্তের কাছে দাসানুদাস। স্ত্রীর কাছে রসরাজ রসিক।

বিজ্ঞানীর অবস্থা, যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা, যেমন ঠাকুরের অবস্থা — বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ। বালকের অবস্থায় আবার — বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন। পৌগণ্ড (পাঁচ বৎসর হইতে পনের বৎসর) অবস্থায় ফচ্‌কেমি করে, উপদেশ দেবার সময় যুবা।

একজন ভক্ত — শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে কেন দেখা করতে গিছলেন ভূধরবাবুর বাড়িতে?

শ্রীম — ওঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার করতে। বলতে, একটু সাধন ভজন তপস্যা কর। তবে তোমার কথায় কাজ হবে — লোক শুনবে। নইলে এ-কান দিয়ে শুনবে ও-কান দিয়ে বের হয়ে যাবে।

আর একটা উদ্দেশ্য আছে — ঠাকুরের সমাধি, ঈশ্বর প্রেম, — কখনও বালকবৎ কখনও উন্মাদবৎ, — এ সব অবস্থা দর্শন করবে শশধর। পণ্ডিতরা শাস্ত্র পড়ে মাত্র। দর্শন দুর্লভ। স্বামী দয়ানন্দ ঠাকুরের সমাধি দেখে বলেছিলেন, এর কথা শাস্ত্রে পড়েছি। আজ প্রত্যক্ষ হলো।

সৎ ধর্ম প্রচারের জন্য অবতারের আগমন। শশধর হিন্দুধর্মের প্রচারক, বুদ্ধিমান ও ভক্তিমান লোক। তাঁর ভিতর ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা ঢুকিয়ে দিলেন। ঠাকুরের সমাধি দেখে কাঁদতে লাগলেন আনন্দে। তাঁর মুখে জ্ঞান উপদেশ শুনেও কাঁদতে লাগলেন। 'দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি।'

এই গানের ভাব ও ভাষা এক হয়ে গেল। 'জ্বলন্ত বিশ্বাস' কি — তা ঠাকুরে আজ প্রত্যক্ষ করলেন।

পণ্ডিতের প্রশ্ন — কিরূপ ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? ঠাকুর বললেন, 'জ্বলন্ত বিশ্বাস'-যুক্ত ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রকৃতি অনুসারে ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ ও ভক্তির তমঃ, এই তিন ভাগ। ভক্তির সত্ত্ব যার, সে মশারির ভিতর ধ্যান করে, গোপনে সব করে। ঈশ্বর সব জানেন দেখেন, এ বিশ্বাস তার।

ভক্তির রজঃ যার, সে লোকজন ডেকে পূজাপাঠ উৎসব করে। লোকে বলুক সে ভক্ত — এটা চায়। গরদ, মতির মালা এসব পরে। সোনার রুদ্রাক্ষ।

ভক্তির তমঃ — যেন ডাকাত পড়া ভাব — মার কাট, জয় কালী, বম্ বম্, জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভাবে, আমি তাঁর নাম করেছি, আমি শুদ্ধ হয়ে গেছি — এ প্রবীরের ভাব।

অক্ষয় — 'এর লেজ খসেছে', এর ভাবার্থ কি?

শ্রীম — বেঙাচির যতদিন লেজ থাকে ততদিন জলে থাকে। লেজ খসে গেলে সে তখন জলে ও স্থলে থাকতে পারে। ঠাকুর কেশববাবুকে বলেছিলেন, ইনি এখন সংসারেও থাকতে পারেন, বাইরেও থাকতে পারেন। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ হয়েছে, এই অর্থ — সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকবে না।

ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন সেকেণ্ড ডে-তে (দর্শনের দ্বিতীয় দিনে) মন দুধ, সংসার জল। নির্জনে দুধকে আলাদা করে দই পেতে, মাখন তুলে, সংসারে অর্থাৎ জলে থাকলে দুধ ও জল আর মিশবে না। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করে, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ, এইটে জেনে সংসারে থাকা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল, শনিবার শুক্লা দশমী।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধবিহার, চার্চ ও ব্রাহ্মসমাজে শ্রীম

১

বুদ্ধমন্দির। কপালীটোলা। মধুকর শ্রীম মন্দিরের সম্মুখে মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। পশ্চাতে বিনয়, ডাক্তার ও জগবন্ধু। মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে একজন সেবক দাঁড়াইয়া আছেন। সকল প্রবেশার্থীকেই বলিতেছেন 'জুতা ভিতরে যায় না' — এই বিনম্র নিবেদন-বাণী।

মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের প্রস্তরমূর্তি। শ্রীম প্রণাম করিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আছেন।

শীতকাল ডিসেম্বর মাস। মন্দিরের ভিতর খুব গরম। গৃহের দক্ষিণ দিকে বুদ্ধদেবের মূর্তি। চারদিকে ভক্তগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে জ্বলন্ত মোমবাতি মূর্তির সম্মুখে উপহার দিতেছে। লোকে লোকারণ্য।

মর্টন স্কুল হইতে শ্রীম ডাক্তার বক্সীর মোটরে পাঁচটায় রওনা হইয়াছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট, মির্জাপুর, কলুটোলা দিয়া সেন্ট্রাল এভিনিউ হইয়া বৌবাজার পার হইয়া মোটর কপালীটোলায় প্রবেশ করিল।

এখন সওয়া পাঁচটা। আরতি আরম্ভ হইয়াছে। বালকগণ কাঁসর ঘন্টা বাজাইতেছে মন্দিরের ভিতরে। আর বাহিরে রহিয়াছে একটা ব্রহ্মদেশীয় গং। একজন ভক্ত উহা বাজাইতেছে বৌদ্ধরীতি অনুসারে। কিছু পালি ভাষার স্তবাদি আবৃত্তি করিয়া আরতি শেষ হইল।

মন্দিরাভ্যন্তর বৈদুতিক আলোতে উদ্ভাসিত। শ্রীম দেয়ালগাত্রে শোভিত বুদ্ধদেবের নানা প্রকার ছবি দেখিতেছেন। সবই তাঁর দিব্য জীবনলীলার আলেখ্য। নিদ্রারত সদ্যোজাত পুত্র ও পত্নীকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। বহু মূল্যবান রাজপোশাক বিনিময় করিতেছেন দরিদ্রের

শীর্ণ মলিন বস্ত্রের সহিত। বোধিদ্রুম তলে নির্বাণের ব্রহ্ম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত বদনমণ্ডল। ভিক্ষুদের প্রতি উপদেশ। ইত্যাদি।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — কোনও উপদেশ মনে আছে কি? বল না।

ভক্ত — 'নিব্বাণাং পরমং সুখং।' সকলের প্রতি করুণা ও মৈত্রী ভাব রক্ষা করিবে। সত্য থেকে বড় মুক্তিদাতা জগতে কেহ নাই। সত্য চিরস্থায়ী। সদা সত্যরক্ষা করিবে।

একটি স্বেচ্ছাসেবক অন্তেবাসীর নিকট হইতে শ্রীম-র পরিচয় পাইলেন। তিনি গিয়া মহাস্থবিরকে কহিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম আসিয়াছেন। মহাস্থবির বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, এই বুদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াকে শ্রীম-র অভ্যর্থনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ডক্টর বড়ুয়া এই বিহারের সহকারী সম্পাদক। ইনি শ্রীমকে সাদরে নমস্কার করিয়া হলঘরের পশ্চিম দিকের মেঝেতে পাতা কার্পেটে নিয়া বসাইলেন, আর মিষ্টালাপে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। হলঘরের উত্তর দিকে স্ত্রী ভক্তগণ বসিয়াছেন মেঝেতে সতরঞ্জির উপর। পুরুষগণ বসা স্ত্রীগণের দক্ষিণে। স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তদের মধ্যস্থলে একটি পাতলা পরদা।

নানাদেশীয় ভক্তগণে গৃহ পরিপূর্ণ — বাঙ্গালী, বর্মী, আরাকানী প্রভৃতি। পুরুষ ভক্তগণ তাম্রকুট সেবন করিতেছে। পীত বস্ত্র পরিহিত ভিক্ষুগণ কর্মব্যস্ত হইয়া গৃহের ভিতর আসা যাওয়া করিতেছেন। হলের এক কোণে ট্রাঙ্ক, বিছানা, গাঁঠরির স্তূপ।

এবার আসিলেন মহাস্থবির। বয়স প্রায় সত্তর। ক্ষীণকায়, চট্টগ্রামের লোক। শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, 'কথামৃত'-কার শ্রীমকে ধর্ম জগতে কে না জানে? ইনি জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ইনি অমায়িক লোক। আনন্দে শ্রীমকে বলিতেছেন, আমি আপনার 'কথামৃত' পড়িয়াছি। সত্যই ইহা অমৃতের ভাণ্ডার। অমন গ্রন্থ জগতে দুর্লভ।

স্থবির আনন্দে বলিতে লাগিলেন, আমার শিষ্যগণ নানা স্থান হইতে আসিয়াছে এই উৎসবে যোগদান করিতে। এখানে ভগবান তথাগতের

অস্থি-মন্দির হইবে। ভারত সরকার এক টুকরা অস্থি উপহার দিয়াছেন! কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী আজ এই অস্থি স্থাপন করিয়াছেন ঐ বাহিরে একস্থানে। দেখিয়া আসিবেন একবার। আপনি আসায় আমার বড় আনন্দ হইল। আমার শিষ্যগণও খুব আনন্দিত। কয়দিন ধরিয়া এই উৎসব চলিবে। সুবিধা হইলে অবশ্য দর্শন দিবেন। আমরা সকলে সুখী হইব। মহাপুরুষদের শুভাগমনে স্থান জাগ্রত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার। আপনি তাঁহার প্রিয় পার্ষদ। 'কথামৃত' রচয়িতা কলির বেদব্যাস।

শ্রীম উৎসবের একখানা প্রোগ্রাম চাহিলেন। মহাস্থবিরের ইঙ্গিতে একজন সেবক শ্রীম-র হাতে আনিয়া একরাশি হ্যাণ্ডবিল ও পুস্তিকা দিলেন। শ্রীম একখানা হ্যাণ্ডবিল ও একখানা পুস্তক রাখিয়া বাকী সব অধ্যক্ষ ভিক্ষুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন।

অধ্যক্ষ শ্রীমকে অনুরোধ করিলেন, একবার দ্বিতলের মন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিবেন। শ্রীম কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। গৃহটির শান্ত বাতাবরণ উপভোগ্য। উচ্চভাবে মণ্ডিত।

এবার শ্রীম নিম্নে অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন — পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। ধাতু মন্দিরের স্থান দর্শন করিতেছেন। উপরে চন্দ্রাতপ। আজ এই মন্দিরেরই ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। তাই এই উৎসব। শ্রীম-র পাশে দুই চারিজন ভিক্ষু দণ্ডায়মান অতি সম্ভ্রমে। শ্রীম মাঝে মাঝে দুই চারিটি কথা কহিতেছেন ভিক্ষুদের সঙ্গে।

নানা স্থানের বৌদ্ধ ভক্তগণের আনন্দ ও আগ্রহ দেখিয়া একজন ভক্ত ভাবিতেছেন — কি আশ্চর্য দেশ ভারত! আড়াই হাজার বছর হইয়া গেল ভগবান বুদ্ধ যথার্থ শান্তিসুখের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আজও তাঁহার নামে জগতের কত লোক শোকতাপ ভুলিতেছে, আনন্দ লাভ করিতেছে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া। কত বড় বড় রাজা, বীর — আসিয়াছেন, চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম তো কেহ করে না। ধর্মই মানুষের পরম সুহৃদ। শান্তি-সুখদাতাই অনন্তকালের বন্ধু।

শ্রীম-র ইঙ্গিতে অন্তেবাসী একজন ভিক্ষুর সহিত বৌদ্ধগণের আহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

অন্তেবাসী (ভিক্ষুর প্রতি) — পুস্তকে পড়েছি, "অহিংসা পরমো ধর্ম'— বৌদ্ধধর্মের এটি একটি মূল নীতি। কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে এই নীতি কতদূর পালন করা হয় এ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভিক্ষু — মাছ, গাছ সবই খায় এরা। খাওয়ার restriction (বাছবিচার) থাকলে চীন জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার মোটেই হতো না।

অন্তেবাসী — হিন্দুধর্মেও তাই। একদল নিরামিষাশী, একদল আমিষাশী। শাস্ত্রাদিতেও তাই দেখতে পাওয়া যায় — তা' না হলে চলে কি করে? আত্মজ্ঞান লাভ ধর্মের মূলকেন্দ্র। এটা লাভের জন্য আহার সংযমের চাইতেও মন সংযমের দরকার বেশী।

ভিক্ষু — আগে আহার-সংযম, কি মন-সংযম দরকার?

অন্তেবাসী — হাঁ, মন-সংযমেরই প্রাধান্য। পরমহংসদেব বলতেন, শূকরমাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরচিন্তা করে, সে ধন্য। কিন্তু নিরামিষ খেয়ে যদি কামিনীকাঞ্চন চিন্তা করে, সে ধিক্। পরমহংসদেব আরও বলতেন, দেখ, সিংহ মাংস খায় কিন্তু বার বছরে স্ত্রী গমন করে। আর চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু মিনিটে দশবার কামসেবা করে। পরমহংসদেব আরও বলতেন, ঈশ্বরে ভক্তিলাভ হলে, কাম ক্রোধ আপনি গলে পড়ে যায়, ঝরে যায় — যেমন মোমবাতি আগুনে গলে যায়। বলতেন, ঈশ্বরভক্তি কেমন জান? যেমন বাঘ কপকপ করে ছাগল খেয়ে ফেলে, তেমনি ঈশ্বরভক্তি। এ কাম ক্রোধ খেয়ে ফেলে।

ভিক্ষু — এই খাদ্যাখাদ্য বিচার নিয়েই যত ঝগড়া, নির্বাণের বা ব্রহ্মজ্ঞানের নামে। ভগবান তথাগতের মূল উদ্দেশ্য যে নির্বাণলাভ, তা-ই ভুল হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজে বলেছেন, 'নিব্বাণং পরমং সুখং।' আমরা এইসব বিচার করে করে গোলাম হয়ে পড়েছি। কাদের কাছে? যারা এই বিচারে বৃথা সময় নষ্ট করে না, যারা আমিষভোজী।

অন্তেবাসী — ঠিক বলেছেন, মুসলমানগণ সাত শ' বছর ভারতে রাজ্য করলো। আর পশ্চিমের খ্রীস্টান, গত প্রায় তিনশত বছর। আমরা পরস্পর ঝগড়া করছি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মূল বিষয় ছেড়ে। মাঝখান থেকে আমিষভোজী শক্তিশালী জাতের লোক এসে ভারতকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

ভিক্ষু — খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আপনার কি মত?

অন্তেবাসী — আমার মনে হয়, যেখানে যা বেশী পাওয়া যায় সহজে, তা দিয়ে মানুষ উদর পূরণ করে। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তারপর ঈশ্বরের দিকে যত অগ্রসর হবে ততই মন সূক্ষ্ম হয়। তখন কোনও রকমে সহজলভ্য সহজপাচ্য যা পায় তাতেই জীবিকা নির্বাহ করে, ভগবৎচিন্তায় মগ্ন হয়। ক্রাইস্ট আমিষভোজী, কিন্তু ঈশ্বরাবতার। মহম্মদও তাই। তিনি পয়গম্বর। তাঁদের কত ভক্ত ঈশ্বরদ্রষ্টা। ঈশ্বর-ভক্তদের বিচার আলাদা, জনসাধারণের বিচার আলাদা। জনসাধারণের জন্য এক বিচার খাটে না। কারণ, দেশকাল ভিন্ন। যেখানে যা সুলভ, সেখানকার লোকের জন্য তাই ভোজ্য।

শ্রীম অদূরে দাঁড়াইয়া এই বিচার শুনিতেছেন।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে উৎসবস্থলী সর্বত্র দর্শন করিতেছেন। সঙ্গে দুই চারজন ভিক্ষু। এক স্থানে উৎসবের রান্না হইতেছে। বহু লোক, বিরাট আয়োজন। ভক্তগণ অধিকাংশই আমিষাশী। এক স্থানে তাই এক গাড়ী রোহিত মৎস্য আসিয়াছে। তাহারই অদূরে পিঁয়াজের রাশি। বাঙ্গালী, আসামী, আরাকানী ও বর্মী ভক্তই বেশী। তাহারা মৎস্যাশী। তাই এই আয়োজন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীম ভক্তসঙ্গে মোটরে উঠিলেন।

২

শ্রীম আজ মধুকর। মধু আহরণে নানা ধর্মপুষ্পে গমনাগমন করিতেছেন। এইমাত্র বৌদ্ধ ভক্তসঙ্গে বুদ্ধদেবের উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন। মোটরে বসিয়া বলিতেছেন, এক রাম তাঁর হাজার নাম। বেদে আছে এই কথা — 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' বুদ্ধদেবের নির্বাণ আর বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান, একই বস্তু — approach (পথ) ভিন্ন। উপনিষদের ঋষিদের পথ constructive (সংগঠনমূলক), বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি destructive (ধ্বংসমূলক)। ঋষিরা ব্রহ্মসত্যের উপর জোর দেন, বুদ্ধদেব জোর দেন জগৎ মিথ্যার উপর — 'সব্বং শূণ্যং শূণ্যং ক্ষণিকং ক্ষণিকং'। বললেন, বাসনাই জগৎ। মননাশে বাসনানাশ। বাসনার

নাশ হ'লে জীবের শান্তিসুখের ভাণ্ডার আপনি সম্মুখে সমাগত হয়। বাসনার নির্বাণ হ'লে পরমসুখ লাভ। পরমসুখকে নির্দেশ করেছেন বুদ্ধ — বাসনার নির্বাণ, নির্বাণ বলে। ঋষিরা জোর দিয়েছেন — ব্রহ্মসত্যের উপর আর জীবব্রহ্ম—'অহং ব্রহ্মাস্মি'র উপর। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সাধন করতে করতে জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে জগৎ অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

উভয় প্রণালীতেই জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করতে হবে। এক মতে, বাসনার সঙ্গে জগৎ মিথ্যার জ্ঞান হয়। আর এক মতে — 'আমি ব্রহ্ম' এই চিন্তা দ্বারা মনের মনত্ব বিনাশে ব্রহ্মত্ব লাভ। ব্রহ্মত্ব লাভে জগৎ-জ্ঞান বিনষ্ট হয়। 'ব্রহ্মসত্যং জগৎ মিথ্যা জীবব্রহ্ম এব নাপরম্!'

ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম স্বতন্ত্রভাবে সাধন করেন নাই। তাঁর জ্ঞানপথের সাধনের দ্বারাই বৌদ্ধমতের সাধন হয়ে গেছে। জগৎ মিথ্যা বোধ হলে যা থাকে তা-ই মানুষের লক্ষ্য, উহাই মুক্তি। উহাই নির্বাণ, উহাই নির্বিকল্প সমাধিতে লভ্য ব্রহ্মজ্ঞান।

ঠাকুর বলতেন, বুদ্ধদেব এমন স্থানে পৌঁছেছেন যে, মুখে আর কিছু বলতে পারেন নাই। সেখানে সকল দ্বৈত বিনষ্ট হয়ে গেছে। যা আছে তাই আছে — মুখে বলা যায় না। এ অবস্থা বুদ্ধদেবের লাভ হয়েছে, ঠাকুরেরও লাভ হয়েছে। ঠাকুর বিদ্যাসাগর মশায়কে তাই বলেছিলেন, সব বস্তু উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। কারণ মুখ দিয়ে যা বলা হয়, তাই উচ্ছিষ্ট। এই অবস্থার ইঙ্গিত করেছেন স্বামীজী — 'অবাঙ্মনসগোচরম্' — 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার' — প্রলয় সমাধির গানে।

স্বামীজী বুদ্ধদেবকে খুব মান্য দিতেন। দুই কারণে — প্রথম, তাঁর সর্বগ্রাসী এই পরমানন্দলাভের জন্য। আর দ্বিতীয়, তাঁর জীবসেবার জন্য। তাঁর হৃদয়ের খুব সুখ্যাত করতেন। কত সেবা প্রতিষ্ঠা করেন — পশুপক্ষীর পর্যন্ত সেবা। স্বামীজী বলেছিলেন, ঠাকুর শংকরের intellect (বুদ্ধিবৃত্তি) ও বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে এসেছেন। বুদ্ধদেব অবতার।

শ্রীম-র মোটর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট দিয়া চলিতেছে। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে — থোবার্ণ মেথডিস্ট চার্চের দোরগোড়ায়। উদ্দেশ্য, খ্রীস্টধর্ম-পুষ্পমধু আহরণ। শ্রীম বলেন, ঠাকুর

এমনি একটা চশমা পরিয়ে দিয়েছেন যার জন্য সকল ধর্মকেই আপনার বলে মনে হয়! তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পূর্বে এ দৃষ্টি ছিল না। এই দৃষ্টির উৎস তিনি। তিনি নিজে লং সাহেবের গির্জায় গিছলেন কেউ কেউ বলে। বাইরে থেকে ধর্মসভা দর্শন করেছিলেন। মথুরবাবু সঙ্গে করে নিয়ে গিছলেন। নববিধানের কাছেই এই গির্জা আমহার্স্ট স্ট্রীটে। ধর্মতলায়ও গিছলেন, এ-ও এক মত। ধর্মতলায় রাস্তার পাশে এই চার্চ। তিনি বলেছিলেন, বাইরে থেকে mass (ম্যাস — সমবেত উপাসনা) দেখেছিলেন। এ মত বেশী সমীচীন। জানবাজার থেকে আসতে এই গির্জা রাস্তায় পড়ে। মথুরবাবু সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীম গির্জার প্রবেশপথে অগ্রসর হইতেছেন। কি আশ্চর্য, হঠাৎ একটি মধ্যবর্ষীয় পশ্চিমী সাহেব ছুটিয়া আসিয়া অতি মধুর স্বরে সহৃদয় অভ্যর্থনা করিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, Good evening Sir, come in, please! (নমস্কার মহাশয়, আসুন ভিতরে)।

একটি ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছেন — হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী পুরুষ জাগ্রত হইলে তাহার সৌরভ ভক্ত অলিকুলের হৃদয় স্পর্শ করে দেখিতেছি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শে ধনী, একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির ভাণ্ডার, তত্ত্বদর্শী শ্রীম-র তো কোন বাহ্য চিহ্ন নাই। তিলক, মালা, বস্ত্রাদি ভেক চিহ্ন তাঁহার অঙ্গে নাই। শুভ্র সাধারণ বস্ত্র পরিহিত তিনি। লংক্লথের পাঞ্জাবি অঙ্গে। তাহার উপর মোটা খদ্দরের ভাঁজ করা চাদর গলদেশে লম্বমান। পায়ে কাল বানির্শ করা ময়লা চটি। এই সাহেব কি করিয়া বুঝিল, ইনি মহাপুরুষ! তাই এই সশ্রদ্ধ আবাহন। আরও অনেকবার এই রূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছে। হৃদয়ের ভাব হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে গির্জাতে প্রবেশ করিলেন উত্তরমুখী হইয়া। সর্বোত্তরে বেদী। বেদীতে যাইবার রাস্তার দুই দিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান বেঞ্চের শ্রেণী। শ্রীমকে লইয়া গিয়া সাহেব পূর্বদিকে প্রথম বেঞ্চে বসিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমে ডাক্তার, তারপর শ্রীম, তারপর বিনয় ও জগবন্ধু। প্রার্থনা দ্বারা উপাসনা আরম্ভ হয়। তারপর সমবেত সঙ্গীত পাশ্চাত্ত্য প্রথানুসারে। তারপর সারমন্। পাদরী বক্তৃতা দিতেছেন, বিষয় —

পতিতপাবন যীশু। বলিতেছেন, পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্য ভগবান তাঁর only son-কে (একমাত্র পুত্রকে, অবতারকে) পাঠিয়ে দিয়েছেন জগতে। Father আর son এক। ইহুদী জাতি পাপপঙ্কে ডুবে ছিল। তাদের তুলতে তাঁর আগমন ও শরীর বিসর্জন। সত্য কথা বলায় তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করলো। আজ তাঁরই জয়। যারা মেরেছে তাদের পরাজয়। কেউ তাদের ভালবাসে না। জগতের সকলের অপ্রীতিভাজন ঐ 'জু'গণ, আর আজ জগৎপূজ্য ক্রাইস্ট — দু হাজার বছর ধরে।

ঘৃণা দ্বারা ঘৃণা জয় করা যায় না। ঘৃণা জয় হয় ভালবাসায়। যীশু তাই দেখিয়েছেন নিজ জীবন দান করে। তিনি তারস্বরে সকলকে ডেকে বলেছিলেন — 'Come unto me all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest... For my yoke is easy, and my burden is light'. (St. Matt 11:28-30) এসো সব, যত পাপীতাপী, এসো সংসারের দুঃখক্লিষ্ট জনগণ। আমি সত্যি করে বলছি, তোমাদের শান্তিধামে পৌঁছে দিব। কিছুই করতে হবে না। সাধনেরও চাপ নাই। সহজেই শান্তি, আনন্দ লাভ কর। ভালবাস ভগবানকে, আর ভালবাস জীবগণকে। এতেই চির শান্তি সুখ — etarnal life লাভ করবে। ধন্য হবে।

সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম আসিয়া মোটরে উঠিলেন।

এবার নববিধান ব্রাহ্মসমাজে। মোটর বৌবাজার, কলেজ স্ট্রীট হইয়া মেছুয়াবাজারে সমাজ-মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়াছে। শ্রীম ও ভক্তগণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন — পশ্চিম দিক দিয়া। সারমন্ হইতেছে। পুলপিটে আচার্য প্রমথ সেন বসিয়াছেন। আধ ঘন্টার পর বক্তৃতা শেষ হইল। প্রমথ সেন নিচে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমকে নমস্কার করিয়া মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। কেশব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীম-র সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিলেন। বহুকাল দেখেন নাই। তাই চিনিতে পারিলেন না দেখিয়া প্রমথবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীম এই সেন পরিবারের জামাতা। শ্রীম-র ধর্মপত্নী কেশব সেনের সম্পর্কিয়া ভগিনী। এই স্থানে মোটরে ডাক্তার বক্সীকে স্বগৃহে কাশীপুর পাঠাইয়া দিলেন।

৩

শ্রীম পদব্রজে আসিয়া মর্টন স্কুলের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে। আসামের অক্ষয় ডাক্তার আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দার পূর্বপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। এখানে পালি ক্লাস হয়। ভক্তগণ অতক্ষণ শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন — গদাধর, ছোট রমেশ, 'ব্রুকবণ্ড' যতীন, রমণী, মনোরঞ্জন, ছোট নলিনী, উকিল ললিত ব্যানার্জী প্রভৃতি।জগবন্ধু ও বিনয় শ্রীম-র সঙ্গে ফিরিয়াছেন।

শ্রীম বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মমন্দিরে চারি ঘন্টা ধরিয়া ভ্রমণ করায়, পরিশ্রান্ত। বৃদ্ধ শরীর। তাই বসিয়া নির্বাক বিশ্রাম লইতেছেন। ভক্তগণ সকলে চারিদিকে বসা সব বেঞ্চে। কিছুক্ষণ পরে মৌনভঙ্গ করিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এখন রাত্রি আটটা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ আমরা কত দর্শন করলুম। এখানে বসে আছি যেন নবদ্বীপে। নিচে (অক্ষয় ডাক্তারের বাড়িতে) কীর্তন হচ্ছে। আবার (বুদ্ধমন্দিরে) কপিলাবস্তু, আর বোধিদ্রুম (গয়াতে)। এঁদের (নববিধান ব্রাহ্মসমাজের) ওখানে তপোবন। আর ওখানে (মেথডিস্ট চার্চে) প্যালেস্টাইন। এত সব তীর্থ দর্শন করে এলাম।

যান না আপনারা কীর্তন শুনতে — যাদের ইচ্ছা আছে। কেউ যে যায় না। আচ্ছা, যাদের উৎকট আগ্রহ আছে তারা যান।

ছোট নলিনী ও মনোরঞ্জন উঠিয়া নিচে গেলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আগে কীর্তন শুনতে কত জায়গায় যেতাম। কোথায় পোস্তা, কোথায় শ্যামবাজার। জল বৃষ্টি কাদা ঠেলে গিয়ে বসে থাকতুম। এখন আর চলে না, বুড়ো শরীর।

শ্রীম আসন হইতে উঠিয়া সিঁড়ির কাছে আসিলেন, উপরে যাইবেন। এটর্নি বীরেন বসু ও অমৃত গুপ্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন। অমৃতের হাতে তাল মিছরী। শ্রীম মাঝে মাঝে দুর্বলতা বাড়িলে উহা খান। ভক্তদের লইয়া গিয়া পুনরায় পুর্বের আসনে বসিলেন। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — আজ কোথায় (ধর্মস্থান) গিছলেন? বুদ্ধদেবের উৎসব হচ্ছে, যান না। ফস্ করে দেখে আসুন না। আপনাদের

আপিসের ওদিকে কপালীটোলায়।

বীরেন — সময় নেই।

শ্রীম — এমনি দুমিনিট, খালি দাঁড়িয়ে দেখে আসা।

বীরেন — খড়দহে রাস হচ্ছে বেশ। আমরা গিছলাম। বিদুর অক্রুর — এসব মূর্তি করেছে।

শ্রীম — জানলে আমিও যেতুম আপনার সঙ্গে।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম (বীরেন প্রভৃতির প্রতি) — কীর্তন শুনতে কত দৌড়োদৌড়ি করতুম। কোথায় কীর্তন, কোথায় পাঠ — এসব নিয়ে কত করেছি।

শিশির ঘোষের ওখানে যেতাম। তখনও তিনি 'অমিয় নিমাই চরিত' লেখেন নাই। খুব কীর্তন করতে পারতেন। তাঁর ভাই মতিবাবুও থাকতেন। শিশিরবাবুই অমৃত বাজার পত্রিকা আরম্ভ করেন। তখন ওদিকেই আমাদের বাসা ছিল। একবার কালীঘাট গিছলাম কীর্তন শুনতে। তখন ঘোড়ার ট্রাম ছিল। রাত্রে শুনে ট্রামে ফেরৎ এলাম।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম — কেশববাবুর ছেলেকে দেখে আজ বড় আনন্দ হল। আমি রোজ খুঁজি যদি এদের দেখতে পাই। এ ছেলেটির বয়স একচল্লিশের কম নয়। কেশববাবু গেছেন একচল্লিশ বছর হয়েছে।

কি ভালবাসাই বাসতেন ঠাকুর কেশববাবুকে। মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিন দিন চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলেন শোকে। প্রায় আট মাস পরে করুণা গেলে, তার গায়ে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এই ছেলেটিকে আজ দেখে কি আহ্লাদ হল। কেন হবে না? কত বড় বাপের ছেলে। এমন লোকের ছেলের কোন গুণ না থাকলেও ভালবাসতে ইচ্ছা হয়।

করুণার ছেলেকেও দেখলাম। করুণা ডাক্তার খাস্তগীরের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এই ছেলের মায়ের একটি গান শুনেছিলাম। এখনও যেন শুনছি সে গান! কি কণ্ঠ! তখন বুঝি বিয়ে হয় নি, কি হয়েছে। হায় মাও গেল, তার বাপও গেল। কিন্তু সেই গ্রামোফোন সাউণ্ড (শব্দ) still ringing in my ears! (এখনও আমার কানে বাজছে)। হাঁ, কি আশ্চর্য!

জগবন্ধু — ঠাকুরের সঙ্গে আপনার মিটিং-এর আগে না পরে?

শ্রীম — বোধহয় আগেই হবে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কেশববাবু যেখানে যেতেন প্রায় সব জায়গাতেই আমরা তাঁর কথা শুনতে যেতাম। আমাদের কি একটা টান ছিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ডাক্তারবাবুর কৃপায় আমাদের আজ বৌদ্ধদের ওখানে, গির্জা, এই সব দর্শন হয়েছে।

আমার ইচ্ছা, সমস্ত কলকাতায় ঈশ্বরকে নিয়ে কি হচ্ছে, সব এক সময়ে দেখা — bird's eye view, উড়ন্ত পক্ষীর দৃষ্টি নিয়ে দেখা। আজ এই সব একই সময়ে দেখা গেল — কে কি ভাবে তাঁকে ডাকছে।

মুসলমান ভক্ত কারো সঙ্গে আলাপ থাকে তো বেশ হয়। হাঁ, মেছুয়াবাজার (মসজিদে) কখনও কখনও আমি যাই। তা ওরা বুঝি অত মিশে না। ধর্মতলা গির্জাতে বেশ দেখা যায় — frontage (সামনেটা) খুব বড়।

আজ যে দেখলুম (বিহার, গির্জা ও ব্রাহ্মসমাজে) — যেন একটি কনসার্ট বাজছে। অনেক রকম যন্ত্র আছে বটে, কিন্তু সবই মিষ্টি লাগলো। এমনি ভাব তিনি (ঠাকুর) ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সবই মিষ্টি লাগছে।

আমার ইচ্ছা যত উৎসব হয় সব দেখা — কে কি ভাবে তাঁকে ডাকছে, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছে। (ভক্তদের প্রতি) যেখানে যে উৎসব হয় আপনারা খবর দিবেন। (মুচকি হাস্যে) দেখবো কেমন পারেন! আজ timely (সময়মত) খবর পাওয়ায় বুদ্ধোৎসব দেখা হলো।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আজ বুদ্ধবিহারে একটি সিনের কথা বারবার মনে উঠছিল। সিন্‌টি কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আম্রবনে। ভূমিতে সামনাসামনি বসা বুদ্ধদেব ও বৃদ্ধ পিতা রাজা শুদ্ধোধন। রাজার হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ। সাত বৎসর পর হারানিধি পুত্রকে সম্মুখে দেখে রাজার মনে কত কথাই উঠাপড়া করছে। একবার ভাবলেন, এইবার পুত্র পুনরায় আমার হবে, সিংহাসনে বসবে। আবার ভাবলেন, এখন তাঁর যে খ্যাতি, তার কাছে এই ক্ষুদ্র রাজ্য তো তুচ্ছ ও হেয় চিতাভস্মমাত্র!

কখনও বিরাট দুঃখের ভিতর বিশাল আনন্দ, আবার কখনও এই বিশাল আনন্দের ভিতর বিরাট বিষাদ। কিন্তু রাজার প্রাণের আবেগ, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। উদ্বেগে প্রমত্তবৎ বললেন, নাও পুত্র, এই রাজ্য গ্রহণ কর। না-না, এ যে তোমার কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ।

পুত্রস্নেহে বিমুগ্ধ রাজার দুরবস্থা দেখে বুদ্ধদেব সাগরসদৃশ সহানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে বললেন — মহারাজ, আমি জানি, আপনি পুত্র সিদ্ধার্থকে কত ভালবাসেন। ঠিক এই ভালবাসা দিয়ে আপনি সকল মানুষকে ভালবাসতে চেষ্টা করুন। তার ফলস্বরূপ আপনি সিদ্ধার্থ থেকেও অসংখ্য গুণ বৃহৎ বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। নির্বাণের পরম শান্তি, অফুরন্ত সুখ আর পরমানন্দ লাভ করবেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজার সকল শোক দূর হল। তিনি আনন্দের অধিকারী হলেন। পুত্র সত্যই অনন্তসুখের অধিকারী। সংসার দুঃখ-দগ্ধ মানবের জন্য সত্যই নূতন পথের আবিষ্কার করেছে। তার এই ত্যাগ ও তপস্যা সার্থক হল। আমরাও ধন্য হলাম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন কি ব্যাপার। বিষয়াসক্ত চিত্ত শুদ্ধোধন পরমানন্দের ভাগী হলেন।

ভাগ্যিস, আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম। নইলে এই সব কথা বিশ্বাস হতো না। সবই সত্য। ঠাকুরের পরশমণির সংস্পর্শে সব লোহা সোনা হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব ভগবান, অবতার।

একজন ভক্ত — বুদ্ধদেব তো সন্ন্যাসী। তবে তিনি ঘরে গেলেন কেন আবার?

শ্রীম — তিনি যে সিদ্ধের সিদ্ধ। তাঁর পক্ষে বেদবাক্যাদি, বিধিনিষেধের — প্রয়োজনের, অবসান হয়ে গেছে। সাধকের পক্ষে অবশ্য-পালনীয়। ঠাকুরও ঘরে ফিরে যেতেন। আবার চলে আসতেন। ঠাকুর বলতেন, মনটিকে সোনা বানিয়ে যেখানে থাক দোষ নেই।

শ্রীম — রাজা সংবাদ দিয়েছিলেন, আমরা শোকেদুঃখে মুহ্যমান। শুনছি, তুমি লোককে শোকমোহের পারে নিয়ে যাচ্ছ। তাই একবার এসে আমাদের শোকদুঃখের পরপারে নিয়ে যাও। তাই এসেছিলেন দয়ায়, মোহে নয়।

শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইলেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। শ্রীমও তিনতলায় যাইবেন নৈশ আহারের জন্য। কিন্তু, কি ভাবিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়াই ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সব দেখছি, inertia (জড়তায় পূর্ণ)। আমরা কথাটা এইভাবে put (উত্থাপন) করলাম — যাঁদের উৎকট আগ্রহ তাঁরা যান। দু'জন বুঝি তা'তে গেলেন।

ভক্তরা সর্বদা ready (তৈরী) থাকবে। কি নাম — নন-কমিশণ্ড অফিসার যেমন থাকে?

অমৃত — সারজেন্ট।

শ্রীম — যেই বললে, এটেন্‌সান — অমনি, এই রকম (শ্রীম নিজে এটেন্‌সানের অবস্থায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন)।

শ্রীম (অন্তেবাসীর কানে কানে) — অমূল্যবাবুর আনা মিহিদানা ভক্তদের দিন।

ভক্তগণ প্রসাদ লইয়া বিদায় হইলেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
রবিবার, শুক্লা একাদশী, ১০।৩২ পল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কি গো, আমি নাকি অনেক নেমে গেছি

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। সন্ধ্যা ছয়টা। শীতকাল। শ্রীম চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। তাঁহার সম্মুখে তিনদিকে ভক্তগণ উপবিষ্ট। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। শ্রীম এক দৃষ্টিতে চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। সকলে কিছুকাল ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে শ্রীম পুনরায় চন্দ্র দর্শন করিতেছেন নিবিষ্ট মনে, আর কি ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ পর কথাবার্তা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ কি তারিখ?

একজন ভক্ত — ডিসেম্বরের ১০ তারিখ।

শ্রীম — ঠিক এই তারিখে ঠাকুর ন'বতের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন সকালবেলা। ঠাকুরকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি, আমি তা হলে এখানে এসে থাকবো? ঠাকুর শুনে খুব খুশি হয়েছেন। Indirectly (প্রকারান্তরে) অনুমতি দিয়ে বললেন, এত যে তোমরা আস এর মানে কি? সাধুকে হদ্দ লোক এক আধবার দেখে। নিজেই উত্তর দিচ্ছেন। বললেন, অন্তরঙ্গ না হলে কি আস! আবার 'অন্তরঙ্গের' অর্থ বলছেন নিজেই। অন্তরঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক — যেমন বাপ, ছেলে, ভাই, ভগ্নী।

মর্টন স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছে। তাই গত ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর শ্রীম ও অন্তেবাসী ব্যস্ত ছিলেন। ৮ই বেলুড় মঠের বুড়ো কার্তিক মহারাজ ও বিবেকানন্দ সোসাইটির তারক ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। শ্রীম তাঁহাদিগের সহিত ঠাকুরের অহেতুক কৃপার কথা বলিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৪টা।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আমাদের এই একটি কথা স্মরণ রাখলেই হবে — ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। আমরা কি তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম? মানুষের কি সাধ্য তাঁকে চিনে। তিনি নিজেই ধরা দিয়েছিলেন।

একদিন একটি ভক্তকে (শ্রীমকে) ঠাকুর বললেন, তোমার শীঘ্র হবে। তোমার সময় হয়েছে। পাখী ডিম ফুটোবার সময় না হলে ডিম ফুটোয় না। তোমার এই 'ঘর'।

বলেছিলেন, তোমাদের বেশী কিছু করতে হবে না। একটু কিছু করলেই হবে। আর এখানে এলে গেলেই হবে।

ভক্তটি ইংরেজী পড়া লোক। ইংরেজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়তে ভালবাসতেন। আর কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে ভালবাসতেন। তাঁর খুব অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে দেখার পর থেকে বদলে গেলেন। ঠাকুরের কথামৃত, চাতকের মত বসে শুনতেন। মরুভূমিতে চলছে পথিক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তার কাছে শীতল জল যেমন তেমনি মনে হতো তাঁর এক একটি কথা।

একটি ভক্ত — 'ঘর' কি?

শ্রীম — 'ঘর' মানে অনুকূল একটা উচ্চ আদর্শ। ঐটে ধরে চলতে থাকুক, এই ভাব। নরেন্দ্রকে বলতেন, অখণ্ডের ঘর। রাখালের সম্বন্ধে বলেছিলেন, কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম, ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে। শশী শরৎকে দেখেছিলেন যীশু খ্রীস্টের দলে। বাবুরামের ঘরের কথায় বলেছিলেন, মহালক্ষ্মীর অংশে জন্ম — রাধারাণীর অংশে। অন্তরঙ্গদের সকলকেই বলে দিছলেন আপন আপন ঘর।

একজনকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন, সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তাঁর মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।

বটতলার রাস্তায় চৈতন্যসংকীর্তন দেখেছিলেন। বলেছিলেন, কারুকে দেখলে তড়াক করে দাঁড়াই কেন জান? আত্মীয় যে! আত্মীয়দের অনেক কাল পরে দেখলে ঐরূপ হয়। বলেছিলেন, আগে সাদা চোখে দর্শন হতো। এখন ভাবে হয়।

একজন ভক্ত — এর মানে কি?

শ্রীম — আগে সর্বদাই ভাবে থাকতেন। তাই সব দর্শনাদি ঐ অবস্থায় হতো। ঐ অবস্থায় থাকলে ভক্ত সংগঠন হয় কি করে, তাই মনকে অনেক নিচে নামিয়ে রাখতে হয়। অবতারলীলা, নইলে হবে কি করে? এরই

জন্যই তো এসেছেন। 'Scatterd sheep'দের (এদিক সেদিক ছড়ানো মেশগণের অর্থাৎ অন্তরঙ্গদের) একত্রে গ্রথিত করা যে অবতারের প্রথম কাজ। তারপর তাদের শিক্ষা। তারপর তাদের অবতারলীলা প্রচারের ভার দিয়ে কাজে লাগান। এখানেই শেষ নয়। সর্বদা পিছে পিছে থেকে কাজ করিয়ে নেন, শরীর চলে গেলেও। স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুর ওয়েস্টে সর্বদা থাকতেন। স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন, 'আমেরিকায় মিচিগান লেকের তীরে বসে (সমাধিতে) শরীর ছাড়বো মনে করেছি। অমনি দেখি ঠাকুরকে সামনে। লুকিয়ে করা কাজে ধরা পড়লে যেমন অপ্রস্তুত হয় মানুষ, তেমনি আমার অবস্থা।' সেদিন বুঝি পূর্ণিমা ছিল।

যাদের দিয়ে তাঁর লীলা প্রচার করিয়েছেন, সর্বদা তাদের পিছনে থাকতেন। এখনও আছেন।

আর একজন ভক্তের (শ্রীম-র) সম্বন্ধে মাকে বলেছিলেন — মা, তোমার কাজের জন্য এঁকে যখন ঘরে রাখবে তখন মাঝে মাঝে দেখা দিও। নইলে কি করে থাকবে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে? নাম করলেন মায়ের কিন্তু নিজেই যে কর্তা।

ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য কি অবতারলীলার প্রচার করা! তিনি সঙ্গে থেকে কাজ করান যেমন ছেলের সঙ্গে বাপ থাকে। তিনি ভক্তদের কণ্ঠে বসে কথা কন। তবেই লোকে শোনে। আর তা'তে কাজ হয়। মানুষ গড়ে। এই ভাবে পরম্পরায় কাজ চলে।

অন্তেবাসী — ভাবে থাকার মানে কি? ঠাকুরকে জগদম্বা বলেছিলেন, তুই ভাবে থাক্।

শ্রীম — ভাবে মানে, ঈশ্বরীয় ভাবে, দেবভাবে। শরীর মানুষের কিন্তু ভিতরের ভাব, চিন্তা — আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বরের। আমিই মায়ের ছেলে। আমিই মা।

দুটি সার্কেল আছে। একটির পিঠে আর একটি লেগে আছে — যেমন দুইজন মানুষ পিঠে পিঠে লেগে আছে। তেমনি দু'টি সার্কেল। একটা ব্রহ্ম, অপরটা জগৎ। ঠাকুর অবতার শরীর নিয়ে এসেছেন — স্বয়ং পরব্রহ্ম। জগতের কাজে এসেছেন। মন সদা স্বরূপে ডুবে থাকতে চায়, কিন্তু মা ঠেলেঠুলে বাইরে নিয়ে আসেন ব্রহ্ম ও জগতের contact

point-এ (মিলন ক্ষেত্রে)। এইখান থেকে জীবের, জগতের রোগ নির্ণয় করেন ও প্রতিকার বিধান করেন। ঠাকুরের অবস্থান এই contact point-এ (মিলন ক্ষেত্রে)। তাই ভাবে থাকা। ভাবমুখে থাকা।

একজন ভক্ত — কথামৃতে আছে — মহিমা চক্রবর্তী বলতেন, ঠাকুরের অবস্থা আগে খুব উঁচু ছিল। এখন নেমে গেছে। শেষের দিকে ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন বলে কি ঐকথা বলতেন?

শ্রীম — হাঁ। (সহাস্যে) মহিমা চক্রবর্তী বলতেন, এখন নরেনের যে অবস্থা বার বছর আগে আমার সে অবস্থা ছিল। মোটা বামুন ও হাজরারও এই মত ছিল, এখন ঠাকুর নেমে গেছেন। এঁরা বলতেন, নিজেদের মত পোষ্টাইর জন্য — ঠাকুরই তো বলেন, আগে সাদা চোখে সব দর্শনাদি হতো, এখন ভাবে হয় (হাস্য)। মহিমা চক্রবর্তীই বল, আর মোটা বামুনই বল, কার সাধ্য অবতারকে বোঝে? তাঁরই মহামায়ায় ঢেকে রাখে, বুঝতে দেয় না। মানুষ তো বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। তাঁর এই সব অবস্থা, এই সব লীলা, সবই বুদ্ধির পরপারে। (সহাস্যে) একদিন ঠাকুর বালকের মত জিজ্ঞাসা করলেন মহিমবাবুকে — কি গো, তুমি নাকি বল, আমি অনেক নেমে গেছি? মহিমবাবু অবতার মানেন না। তাঁর মতে কর্মফলে সবই ঠাকুর হতে পারে। এইটে লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন,

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং'।। (গীতা ৯:১১)।

২

শ্রীম আজ আদি ব্রাহ্মসমাজে যাইবেন ডাক্তারবাবুর মোটরে। তাই আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। তিনি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। ভক্তরাও দাঁড়াইলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ডাক্তারবাবুর গাড়ীতে অত লোক যাওয়া ভাল না। (সহাস্যে) তা হলে হেসে কথা কইতে হয় (তাঁর সঙ্গে)।

গদাধর — তা হয়। মহাপুরুষরাও সন্তুষ্ট হন সেবায়।

শ্রীম (প্রতিবাদ করিয়া) — কই, দেখি ঠাকুর (সেবা) নিতেন কিনা। (একটু চিন্তার পর) না। সে তাঁর (ভক্তের) মঙ্গলের জন্য যদি (সেবা)

নিয়ে থাকেন।

শ্রীম নিচে আসিয়া ডাক্তারের মোটরে উঠিলেন। তিনি আদি সমাজে রওনা হইলেন। ভক্তগণ — জগবন্ধু, গদাধর, ছোট নলিনী, শুকলাল, মনোরঞ্জন প্রভৃতি — গেলেন থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে। কুলদা মল্লিক বক্তৃতা করিবেন — বিষয় রাসলীলা।

শ্রীম ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দার পূর্ব ধারে বসিয়াছেন পশ্চিমাস্য। এখানে পালি ক্লাস হয়। ভক্তরা পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতলের বারান্দায় শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা এখন উঠিয়া আসিয়া কেহ শ্রীম-র ডান হাতে, কেহ বাম হাতে, কেহ সামনে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ওখানে (আদি ব্রাহ্মসমাজে) কথা হলো। আচার্য বললেন — পিতঃ, আমরা তোমার (ঈশ্বরের) নিকট ক্ষমা চাইছি — তিনটি বিষয়ের জন্য। প্রথম, তুমি অরূপ, আমরা তোমায় রূপ দিচ্ছি। দ্বিতীয়, তুমি সর্বব্যাপী, তথাপি আমরা তীর্থাদিতে যাচ্ছি। তৃতীয়, তুমি বাক্যমনের অতীত, তথাপি আমরা তোমার স্তব করছি।

বেদব্যাস এইরূপ ক্ষমা চেয়েছেন। এসব ভক্তদের বচনবিলাস ঈশ্বরকে নিয়ে। এক একটা অবস্থায় এক এক রকম। এ জ্ঞানীদের কথা। তারা নিরাকার নির্গুণের উপাসক। রামকে দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা বলেছিলেন, আমরা নিরাকারের উপাসক। ভাগবতে বেদব্যাসই আবার বলছেন, তুমিই নিরাকার তুমিই সাকার। ঠাকুরের কাছে একজন, ঋষিদের এই ভাবের উপর আক্ষেপ করেছিল। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন — না গো, ওরূপ বলো না। যার যা পেটে সয় সে সেরূপ খাবে। তিনি বলতেন, নিত্য ও লীলা দুই-ই সত্য। উত্তরে দক্ষিণে শুনেছি, বরফ গলে না। এটা লীলা ও নিত্য-এর উপমা। আবার কোথাও মহাসাগর, সব জলে জলময়। এটা নিত্যের উপমা। আবার কোথাও সমুদ্রে বরফ ভাসছে। জ্ঞান-সূর্যের কিরণে ঐ বরফ গলে সমুদ্র হয়ে গেছে। এটা লীলা ও নিত্যের উপমা। ঠাকুর তাই বলতেন, যার নিত্য তারই লীলা। আবার যার লীলা তারই নিত্য। আবার বলতেন, 'নী'-তে সর্বদা থাকা যায় না। 'নী'

মানে নিরাকার অত উঁচুতে। তাই 'সা, রে, গা'-তে নেমে থাকা। তাই লীলা বিলাস।

(সহাস্যে) বলতেন, মুদির দোকানে সব রকম জিনিস পাওয়া যায়, ডাল চাল আটা সব। এর মানে এই ঠাকুর ঈশ্বরের তিনটি ভাবই নেন — নিরাকার নির্গুণ, নিরাকার সগুণ আর সাকার সগুণ। ব্রাহ্ম সমাজে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। খ্রীস্টান ও মুসলমান ভক্তগণও তাই নেয়। ঠাকুর সবই নিতেন। এ সব ভাবই তাঁর প্রত্যক্ষ।

ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করতেন। বলতেন, জ্ঞানী 'নেতি নেতি' করে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বিচার করে নিরাকার নির্গুণে পৌঁছয়, নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে। আবার ব্যুত্থিত হওয়ার মুখে দেখে, ঐ অখণ্ড সচ্চিদানন্দই নামরূপে প্রকাশিত। বলতেন, শিব এই অবস্থায় নৃত্য করতেন বিস্ময়ে। মন তখনও নিরাকারেই ডুবে আছে। নাম-রূপের অর্থাৎ গুণের, একটা আঁচড় পড়েছে তাঁ'তে, নিরাকারে। এটা যেন নিরাকার সগুণ। আরও নিচে এলে দেখতেন, ঐ নিরাকারই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। ঠাকুর নিরাকার নির্গুণ থেকে নেমে এসে দেখতেন, সবই মোমের তৈরী — গাছপালা মালী ঘর মানুষ পশুপক্ষী সবই মোমে মোড়া। যেমন ন্যাবা লাগলে সব হল্‌দে দেখে। 'বহু' জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু সবই সচ্চিদানন্দময় — 'এক'-ই এখন 'বহু'। বলতেন, শিব এই অবস্থায় নৃত্য করতেন — 'একি একি' বলে বিস্ময়ে!

ঠাকুর বলতেন শুধু জ্ঞানী ভয়তরাসে। ভয়, পাছে মহামায়ার চক্করে পড়ে না যায় আবার। তাই জীব জগৎকে ভয়। আর বিজ্ঞানী দেখে — সচ্চিদানন্দই জীব জগৎ হয়েছে। কাকে ভয় তা হলে? ঠাকুর বলতেন, আমার মা-ই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমার মা-ই জীবজগৎ হয়ে আছেন। তা হলে কা'কে ভয় করবো?

যদি বল, তা হলে ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতেন কেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না' বলে? এর উত্তর, মন যখন আরও নিচে নেমে যেতো — যখন ভক্তি ভক্ত নিয়ে আছেন তখন মহামায়ার তাজ্জব কাণ্ড দেখে, জীবের ভাব আরোপ করে এই প্রার্থনা করতেন। নিচে নেমে না এলে ভক্ত তৈরী হয় কিসে? অবতার-লীলা প্রকাশ হয়

কি ক'রে।

ঠাকুর বলতেন, 'ঈশ্বরের ইতি হয় না। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত কি! বলতেন তোমার যে ভাবটি ভাল লাগে সে-টি নিয়ে চল। তাতেই তাঁর দর্শন হবে আন্তরিক হলে। কিন্তু একথা বলো না, আমার মতটিই সত্য, অপরের মত মিথ্যা। বরং বল, আমার এইটি ভাল লাগে আমি তাই এটি নিয়ে আছি। তোমার যেটি ভাল লাগে সেটি নিয়ে তুমি চল। বল, সকলেই একজনকেই ডাকছে।' ঠাকুরের ভাবেরও ইতি নাই। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর।

জগতের বর্তমান অবস্থায় এই উদার মতটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সায়েন্সের প্রভাবে সমস্ত জগতের লোক যেন এক পরিবারের লোক হয়ে গেছে। এই ভাবটিতেই জগতের ঐক্য সাধিত হবে।

আমাদের চোখে ঠাকুর এই চশমাটি পরিয়ে দিয়েছেন। তাই সব মতকে ভাল লাগে। সব মানুষকেই আত্মীয় বলে বোধ হয়। তাইতো তিনি নিয়ে যাচ্ছেন সব স্থানে তাঁর নানা ভাবের উপাসনা — পুজো দেখাতে। আজ ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে তাঁর নিরাকার ভাবের পুজো দেখে এলাম।

পূর্বে অনেক গুণবান লোক যেতো এই আদি সমাজে। ঠাকুরও দেখতে গিছলেন। কেশব সেনকে তো ওখানেই দেখে চিহ্নিত করেছিলেন। বয়স তখন তাঁর সাতাশ বছর, ধ্যান করছিলেন। ঠাকুর দেখে বলেছিলেন, 'এর ফাত্না ডুবেছে।'

ওখানে খুব উচ্চ রাগরাগিনীর গান হতো। আর গানগুলিও সুন্দর — বেদের উচ্চ ভাব ভেঙ্গে লেখা। পাখোয়াজ বাজতো। এখন তা' নেই। তাই আমরা আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাখোয়াজ কেন বাজানো হয় না? তিনি বললেন, মানুষ নেই। বাজায় কে?

সারমনে বেশ আর একটি কথা বললেন। বললেন, বেশী লেকচার দিয়ে কি কাজ হবে? তা' যদি হতো গুরু যখন দীক্ষা দেন তখন তিনি তিন চারটা মাত্র কথা বলেন কেন? এতেই তো ভগবানদর্শন হয়। বেশ বলেছেন।

৩

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বলুন বৃন্দাবনের সংবাদ। ওখানে কি হলো। রাসলীলা হয়েছিল বৃন্দাবনে কিনা। আমরা গিছলাম তপোবনে। ঋষিগণ তপোবনে ব্রহ্মোপাসনা করতেন। তাই আমরা তপোবনের সংবাদ বললাম। আপনারা কি শুনলেন ওখানে কুলদাবাবুর বক্তৃতায়, বলুন।

শুকলাল — কুলদাবাবু বললেন, রাস মানে রসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। স্থূল শরীরে গোপীগণ সর্বস্ব ত্যাগ করে স্থূল শরীরধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন। তারই নাম 'রাস'।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের নানা দিক আছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রসরাজ। মথুরায় ও কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ দুষ্কৃতগণের বিনাশকারী আর সাধুগণের পরিত্রাতা। দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজ-ঐশ্বর্যের ভিতর থেকেও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — আপনি কি শুনলেন?

একজন ভক্ত — শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। গোপীগণের ঈশ্বরপ্রেমের সম্মিলিত জমাটবাঁধা মূর্তি শ্রীরাধা। প্রেমিকা শ্রীরাধা, ও প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ। এই দু'টি তত্ত্বই শ্রীচৈতন্যে প্রকাশ পেয়েছে। অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও রাধা ভিন্ন মূর্তি। শ্রীচৈতন্যে ঐ দু'টি মহাসত্য একাধারে প্রস্ফুটিত। শ্রীচৈতন্যে একই আধারে দুটি ভাব দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যে শ্রীক্ষেত্রলীলায় এই রূপটি উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত। শেষের দ্বাদশ বৎসর রাধাভাবে কৃষ্ণকে চিন্তা করে করে মহাভাবে নিমগ্ন। দেহজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, জগৎ অন্তর্হিত। সাড়ে চার হাজার বছর পর ভগবান চৈতন্যরূপে রাসলীলার পুনরভিনয় করলেন, ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য।

শ্রীম (আর একজন ভক্তের প্রতি) — আপনি কি শুনলেন?

আর এক ভক্ত — ভগবান পতিতপাবন।

'অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ'॥ (গীতা ৯:৩০)। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, রাসলীলার প্রকাশ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক হলেও শ্রীচৈতন্য পতিতপাবনও বটে। জগাই মাধাই উদ্ধার এর নিদর্শন। জগন্নাথ ও মাধব দুই ভাই। ব্রাহ্মণসন্তান। বড় ঘরের ছেলে। কুসঙ্গে পড়ে মহা

দুরাচারী হয়। মদ্যপানাদি দুরাচার চরিত্রে প্রবেশ করে। ভক্তগণকে উৎপীড়ন করে। নবদ্বীপে এদের ভয়ে সকল লোক ভীত ও সন্ত্রস্ত। শ্রীচৈতন্যের অপর অর্ধাংশ শ্রীনিত্যানন্দ তাদের হরিনাম দ্বারা সুপথে আনতে বদ্ধপরিকর। বললেন, ভাইসব দুরাচার ছাড়। হরিনাম কর। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মাথায় কলসীর কানা ছুঁড়ে মারে। রক্তাক্ত শির নিত্যানন্দ প্রেমে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে করতে তাদের আলিঙ্গন করতে যান। চৈতন্যদেব সংবাদ পেয়ে ক্রোধে অধীর হয়ে দৈববলে তাদের বিনাশ করতে অগ্রসর হন। নিত্যানন্দ পথ আগলিয়ে প্রার্থনা করেন — প্রভু, কৃপা কর অবোধ সন্তানকে। এই ঘটনা দেখে জগাই মাধাইয়ের অনুশোচনা হয়। নিত্যানন্দের শরণাগত হয়। নিত্যানন্দের প্রার্থনায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপা হয়। তখন তাদের উপর আদেশ হয়, সাধু ভক্তগণের কাছে নিজেদের দুষ্কৃতির কথা বল। গঙ্গার ঘাট সব ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার কর। আর হরিনাম জপ কর। শেষ অবধি নিত্য দুইলক্ষ জপ করে তারপর জল গ্রহণ করত। আজও নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে জগাই মাধাইর ঘাট দেখা যায়। দুর্দান্ত দুরাচারী জগাই মাধাই গৌরনিতাইয়ের কৃপাদৃষ্টিতে আজ জগৎপূজ্য মহাপুরুষ।

শ্রীম (তৃতীয় ভক্তের প্রতি) — আপনি বলুন কি শুনলেন।

তৃতীয় ভক্ত — চৈতন্যাবতারের আর একটি কাজ ভক্ত সংগ্রহ করা। তাঁরা নানা স্থানে নানা ভাবে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের একত্রে সংঘবদ্ধ করা। বাংলার একজন রাজা সুবুদ্ধি রায়। বাংলার মুসলমান নবাব স্ত্রীর প্ররোচনায় কোনও কারণে অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে তার শিরশ্ছেদ না করে বদনার জল খাইয়ে জাতিভ্রষ্ট করে। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু হতে চান। কিন্তু বাংলার ও কাশীর পণ্ডিতগণ বললেন, তুষানলে প্রাণত্যাগই এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। চৈতন্যদেব তখন সন্ন্যাস নিয়ে কাশীতে এসেছেন। রাজা তাঁর কাছে সব নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, বল — হরিবোল। সুবুদ্ধি রায়ও বললেন, হরিবোল। তিনবার মাত্র চৈতন্যদেবের সঙ্গে হরিবোল বললেন। চৈতন্যদেব বললেন, তুমি মহাপবিত্র, শুদ্ধ। যাও, বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত কর। আর সাধু ভক্তের সেবা কর। সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে বাস করেন, ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করেন।

আর জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে মাথায় বোঝা নিয়ে আট মাইল দূরে মথুরায় যান। মুদির দোকানে ঐ কাঠ বিক্রয় করে পয়সা ঐ দোকানেই জমা রাখেন। সাধু ভক্তগণ গৌড়দেশ থেকে এলে ঐ পয়সায় তাঁদের সেবা করেন।

এর পরে পালা রূপ ও সনাতন গোস্বামীর। তাঁরা মুসলমান নবাবের মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ হলেও মুসলমানপ্রায়। রূপ, সাকর মল্লিক, অর্থ সচিব। আর সনাতন দবির খাশ, প্রধান মন্ত্রী। চৈতন্যদেবের জীব উদ্ধারের সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন। নানা চেষ্টায় ও নানা কৌশলে তাঁরা ঐ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্যদেবের আদেশে বৃন্দাবনে বাস করছেন। বৃন্দাবন উদ্ধারের প্রধান পুরোহিত এই দুই ভাইও।

জয়দেবের কথাও বললেন।

শ্রীম — বেশ সব কথা হলো। সব ফুলের মধু সংগ্রহ করে মধুচক্র রচনা করতে হয়। এই কৌশলটি ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে দিছলেন। এই সব আনন্দ নিয়ে থাকা। এতে ভগবানে ভালবাসা হয়। এই ভালবাসার নামই ভক্তি।

রাত্রি প্রায় দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
বুধবার, শুক্লা চতুর্দশী। ৯ দণ্ড। ২৩ পল।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম মানে বিশ্বাস

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। ডিসেম্বর মাস। শীত পড়িয়াছে। এখন সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন, দোরগোড়ায়। ভক্তগণ কেহ সম্মুখে কেহ বাম হাতে বেঞ্চে বসা। এইমাত্র সন্ধ্যার ধ্যান সমাপ্ত হইয়াছে। একথা সেকথার পর শ্রীম কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (অন্তর্মুখীনভাবে) — আজ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। এই দিনে আমরা ঠাকুরের কাছে যাই দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল একটানা বাস করতে।

আজ ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। সেই দিন ছিল ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ। আজ একচল্লিশ বছর হয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন কাল! কি impression (দাগ) লাগিয়ে দিছলেন। কমপক্ষেও হাজার বার এক একটি দিনের কথাচিত্রের ধ্যান করেছি। চাতক যেমন জলের জন্য উৎকণ্ঠিত, তেমনি হয়েছিল আমাদের অবস্থা, ঠাকুরের এক একটি কথামৃতের জন্য। সত্য সত্য অমৃত। কবিতার অমৃত নয়। মরুভূমিতে একটি পথিক চলছে — তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু সামনে। সেই সময় যদি একটি মরূদ্যান মেলে তার প্রাণ যেমন বেঁচে যায়, এও ঠিক তেমনি। বরং তার চাইতে অনন্তগুণ বড়। মরূদ্যানের সুশীতল জল বাঁচিয়ে রাখে পঞ্চভৌতিক দেহ। কিন্তু ভগবানের বাণী, ঠাকুরের কথামৃত বাঁচায় এই দেহ, আবার spiritual body (আত্মিক শরীর)।

এক ভক্ত (শ্রীম) সংসারের জ্বলন্ত অনলে দগ্ধপ্রাণ হয়ে, গিছলো এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করতে। ঠাকুরের সঙ্গে মিলন হওয়ায় তাঁর কথামৃত পান করে সে সংকল্প পরিত্যাগ করা হ'লো। তাঁর অমৃত স্পর্শে মৃতপ্রায় প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়। এই সংসারের পরপারের চিদানন্দের আস্বাদ পাইয়ে দিলেন ক্ষণিকের জন্য সুবিজ্ঞ বাজিকরের মত।

যে জীবনধারণ হয়েছিল দুর্বিষহ, তাই এখন আনন্দময়। ভক্তের ধাঁধা লেগে গেল — এ কে? দেব কি মানব? এই দৈবী আফিং-এর লোভে ভক্ত তাঁর পায়ে জীবন সমর্পণ করলো। তাই গুরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আবার সংসারে ছেড়ে দিল বাজিকর। এখন সংসার কেবল জ্বলন্ত অনল নয়, নিত্যানন্দের বিলাসভূমিও বটে। আনন্দময় স্থানও বটে। এই আনন্দময় ভাবটিকে বাহ্য জগতের সকল ব্যবহারের মধ্যে permanent (স্থায়ী) করার জন্য ভক্ত এখন ব্যাকুল।

ঠাকুর ভক্তদের কয়েকদিন পূর্বেই বলেছিলেন, 'সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়।' আর 'ঈশ্বরদর্শনই মানুষজীবনের উদ্দেশ্য।' একটি ভক্ত (শ্রীম) ন'বতের বারান্দায় বেড়ার আড়ালে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন ঠাকুরের এই উপরোক্ত কথা দুটি ভাবছেন। ঠাকুর ঝাউতলা থেকে ফেরার সময় ভক্তকে ধ্যানস্থ দেখতে পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ন'বতের বাইরে দাঁড়িয়ে ভক্তকে বললেন, 'কি গো তুমি এখানে বসে আছ। তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই। তোমার সময় হয়েছে। পাখী ডিম ফুটোবার সময় হলেই ডিম ফুটোয়।' ভক্ত এই কথায় উৎসাহিত হয়ে কিছুকাল সাধন করতে আজ দক্ষিণেশ্বর এসেছেন।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি চাহিয়া) — ভক্ত ইংরেজী-পড়া লোক — rationalist (যুক্তিবাদী)। অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করে না। একদিন বললেন, 'দেখ একটা মূর্তি দেখলাম। মায়ের মন্দিরে এক পা, আর এক পা পঞ্চবটীতে।' বলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কিগো তোমার এতে বিশ্বাস হয়?'

আর একবার আমরা ভক্তমাল পড়ে ঠাকুরকে শোনাচ্ছি। রাজা জয়মলের কথা। জয়মল কৃষ্ণভক্ত। তিনি বেলা এগারটা পর্যন্ত 'শ্যামলসুন্দর' বিগ্রহের সেবা পূজা করেন একমনে। রাজ্য ধন জন বিনষ্ট হলেও এর ব্যতিক্রম হয় না। এই সংবাদ পেয়ে প্রতিপক্ষ রাজা এই সময়ে জয়মলের রাজ্য আক্রমণ করে। শ্যামলসুন্দর রাজার ঘোড়ায় চড়ে শত্রুপক্ষের সকলকে হত্যা করলেন। কেবল প্রতিপক্ষ রাজাকে জীবিত রাখলেন। পূজার পর

রাজা সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখেন সব হত। প্রতিপক্ষ রাজা এই ঘটনা জয়মলকে বলল। আর পায়ে ধরে বলল, তুমি যে উপায়ে শ্যামলসুন্দরের কৃপা লাভ করেছো এই উপায়টি আমায় বল। আমার ধন জন রাজ্য তুমি নিয়ে যাও।

পাঠান্তে ঠাকুর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এতে বিশ্বাস হয়? আমি বললাম, ভক্ত ব্যাকুল হয়ে ডাকলে ভগবান আসেন, এটা বিশ্বাস হয়। সোয়ার হয়ে এসে শত্রুনাশ করেছিলেন, এটা বিশ্বাস হয় না।

আর একবার বলেছিলেন, 'ওদেশে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছি। দেখি, একটা পাথর সামনে পড়ে আছে। একটু পরেই দেখছি এটা চলতে আরম্ভ করেছে। তার পর ধপ্ করে নদীর জলে পড়ে গেল।'

এই কথা শুনেই আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, পাথর আবার চলে? Rationalist (যুক্তিবাদী) কিনা! তখন ঠাকুর বললেন, 'মথুরকেও বলেছিলাম এই কথা। মথুর শুনে বললে, 'বাবা অপরে বললে বিশ্বাস হতো না। তুমি বলছো তাই বিশ্বাস করছি।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভক্তদের হৃদয়ের গ্রন্থি, আর মনের সংশয় এই সব কথা বলে ভেঙ্গে দিতেন। যাতে ভক্তরা বালকের মত বিশ্বাস করে, তাই করতেন। কেন? না, এতে সব সহজ হয়ে যায়। বলতেন, 'বালকের মত বিশ্বাস চাই। মা বলেছে ও-ঘরে জুজু। তা ষোল আনা বিশ্বাস। জুজু কি তা সে জানে না। তবুও বিশ্বাস।'

বলতেন, 'গুরু বাক্যে অমনি বিশ্বাস।' বলতেন, 'এতে চৌদ্দ আনা পনর আনা হয়ে যায় কাজ। ধর্ম মানে বিশ্বাস।'

শ্রীম ক্ষণকাল চুপ। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) — এইটে আপনি পড়ুন। ইনি আজ বড্ড tired (পরিশ্রান্ত) — অন্তেবাসী আজ সারাদিন স্কুলের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

ডাক্তার কার্তিক বক্সী কথামৃত পড়িতেছেন দ্বিতীয় ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ, ১৪ই জানুয়ারী। আজও অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। ডাক্তার পড়িতেছেন আর শ্রীম মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম বেলা নয়টার সময় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি পাচক। কিছুকাল ঠাকুর তাঁহাকে সাধন শিখাইবেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, কালীবাড়ির অন্ন রোজ খাওয়া ভাল না। এসব সাধু, ভিখারীর জন্য উৎসর্গিত। পাচক রাঁধিয়া দিবে। শ্রীমকে দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, 'বেশ করেছো। আজ বেশ দিন।' শ্রীম-র থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন রামলালদাদা।

২

রামলাল অধ্যাত্ম-রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছেন। শ্রীমও কাছে বসিয়া শুনিতেছেন। রাম মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন জানিয়া পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। দশরথ পুত্র ও বধুকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিবার পথে পরশুরাম গোলমাল আরম্ভ করিয়াছেন। আর একটা ধনু ছুঁড়িয়া মারিলেন আর বলিলেন, এতে জ্যা রোপণ করে বাহাদুরী দেখাও। রাম বাম হস্তে ধনু উঠাইয়া জ্যা রোপণ করিয়া বলিলেন, বল, এই বাণ কোথায় ছাড়ি। পরশু রামের অহংকার চূর্ণ হইল। আর রামচন্দ্রকে পরমব্রহ্ম বলিয়া স্তব করিলেন।

পাঠ চলিতেছে। এখন রাম বনবাসে বাহির হইলেন চৌদ্দ বৎসরের জন্য। গুহক অন্ত্যজ জাতির রাজা। কিন্তু রামের পরম ভক্ত। তাঁহার মিত্রভাব। রাম তাঁহাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন। রাম তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গুহক বলিলেন — আমি তোমার সেবক। আমার যা কিছু সব তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম। তুমি এখানেই থাক। রাম তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন — না মিত্র, বনবাসে থাকতে হবে। এখন চিত্রকুটে যাব। গুহক তখন রামের বনবাসের পোশাক জটা বল্কল পরিলেন। আর বলিলেন, রাম যখন চৌদ্দ বছর পর ফিরবেন তখনই অন্ন গ্রহণ করব। আমিও বনবাসীর ধর্ম পালন করব — জটা বল্কল ধারণ করব। নখ কেশ ধারণ করব।'

চৌদ্দ বৎসর অতীত। রামের কোন সংবাদ নেই। গুহক অগ্নি প্রবেশের সংকল্প করিলেন। অন্তর্যামী রাম জানিতে পারিয়া শীঘ্র হনুমানকে পাঠাইয়া দিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পুষ্পক রথে আসিয়া গুহককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

একজন ভক্ত — এই সব ঘটনা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। প্রাচীন কালের সবই এইরকম। বর্তমান যুগে ইতিহাসে এসব দেখা যায় না।

শ্রীম — এ তো rationalist-এর (যুক্তিবাদীর) বিচার। ঠাকুরই প্রকারান্তরে এ সব খণ্ডন করেছেন। ঐ পূর্বে যা বলা হয়েছে এ দু'টি ঘটনা দিয়ে। ঠাকুর একটা বিরাট মূর্তি দেখলেন। তার এক পা মা-কালীর মন্দিরে, অপর পা পঞ্চবটীতে। আর ঐ প্রকাণ্ড পাথরটা চলতে চলতে ধপ্ করে নদীতে গিয়ে পড়লো। ঠাকুর নিজে দেখেছেন এই দু'টি ঘটনা। একে মিথ্যা কল্পনা বলার যো নাই। মানুষ তার এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যায়!

অত পুরানো ঘটনাতে অতিরঞ্জন আসতে পারে। কত অবস্থার ভিতর দিয়ে শাস্ত্র চলেছে, কত যুগ যুগান্তর ধরে। কিন্তু রামকে যদি ঈশ্বরের অবতার বলে নেওয়া যায় তা হলে তাঁর পক্ষে কি অসম্ভব, কি অলৌকিক? তাই তো ক্রাইস্ট বলেছিলেন, মানুষের পক্ষে অসম্ভব হলেও ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় — সবই হতে পারে। ঠাকুর miracle-এর, অলৌকিকতার, নিন্দা করেছেন। কেন? ধর্ম বলতে সাধারণ লোক তাই বোঝে — অলৌকিক কিছু। কিন্তু ঠাকুরই নিজে আবার এই rationalist-এর (যুক্তিবাদীর) কাছে ঐ ঘটনা দুটি বলেছেন।

কেন ঠাকুরের এই দুই প্রকারের ব্যবহার? এর উত্তর কি করে মানুষ দিবে? বলতেন, ঈশ্বরীয় কাজের সমালোচনা করতে নাই। ভক্তদের জন্যই অবতারের আসা। তাঁদেরই ঈশ্বরমুখী করতে আসেন। প্রধান কাজ এটা। ভক্তরা উঠলেই জগৎ উঠবে। সর্বসাধারণ উঠবে।

ধর্ম বলতে ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান — এইটি ঠাকুরের প্রধান কাজ। এই স্তরে মনকে উঠাবার জন্য সিদ্ধাই-র নিন্দা করেছেন। সিদ্ধাই নাই, যোগবিভূতি নাই, এ কথা তো বলেন নাই। স্বামীজীকে এই যোগবিভূতি, অষ্টসিদ্ধি ঠাকুর দিয়েছিলেন। স্বামীজী নিতে চান নাই। কিন্তু ঠাকুর সেধে দিলেন, বললেন, রেখে দে। তোকে পরে অনেক হনুমানপুরীর সঙ্গে লড়তে হবে।

ঈশ্বরদর্শনের পূর্বে এই সিদ্ধিশক্তি ব্যবহার করাকে ঠাকুর খুব কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। বলেছিলেন, এ কেমন জান? ব্রাহ্মণের বালবিধবা।

হবিষ্যাশী ব্রহ্মচারিণী। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর বয়সে এক বাগ্‌দী উপপতি করলো।

সিদ্ধাই-এর নিন্দার উদ্দেশ্য ঐ — লোকের মনকে হীন বস্তু থেকে ঈশ্বরে চালনা করার জন্য। তা ছাড়া, এখন পশ্চিমী বিজ্ঞানের যুগ। এ সময়ে লোকের সরল বিশ্বাস কম পড়বে! এটাও একটা বিপদ। আবার অতি বিশ্বাস — সিদ্ধাই-ফিদ্ধাইর উপর চেয়ে থাকা, নিজের সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও শক্তি apply (প্রয়োগ) না করে — এটাও একটা বিপদ। ভারতে, প্রাচ্যে (East) বিপদটা বেশী।

এই দুই বিপদ থেকে রক্ষার পথ ঠাকুরকে বের করতে হয়েছে। তাই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে প্রভাবিত তাঁর একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে rationalist-কে (যুক্তিবাদীকে) ঐ দু'টি অলৌকিক ঘটনার কথা বললেন। বললেন, তোমার ঐ ক্ষুদ্র দৃষ্টির বাইরে অনন্ত শক্তির অনন্ত কার্য হচ্ছে। এটা বিশ্বাস কর। বালকের মত বিশ্বাস কর। তবে শীঘ্র ব্রহ্মদর্শন হবে।

ঠাকুরেরই আর একজন ভক্ত অতি বিশ্বাসী। স্বপ্ন-টপ্ন দর্শনের কথা ঠাকুরকে ও অপরকে প্রায়ই বলতো। তাকে ধমক দিয়ে বললেন, এসব কথা আমাকেও বলবি না — অপরকে তো বলবিই না। অতি বিশ্বাস করলে personality-এর (ব্যক্তিত্বের) হানি হয়। চেষ্টা করে না, খালি কর্মফল বা ঈশ্বরীয় কৃপার উপর অসময়ে অনধিকারী হয়ে চেয়ে থাকে। আপন বিচারবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে imbecile (বোকা হাবা) না হয়, এই দিকে ঠাকুরের লক্ষ্য। এও ব্রহ্মদর্শনের পরিপন্থী। অবিশ্বাস ও অতি বিশ্বাস, এ দুটোই খারাপ, দু'টোই বর্জনীয়। অবলম্বনীয় মধ্য পন্থা।

৩

অবতারের পক্ষে দুটো ভারী ধনু ভাঙ্গা — এতে কি আশ্চর্য বা অসম্ভব! আর গুহকের চৌদ্দ বৎসর ব্রতধারণ ও অগ্নি প্রবেশের সংকল্প — এতেই বা কি আশ্চর্য? কত ভক্ত কত কঠোর ব্রতধারণ করছে চোখের সামনে ঈশ্বরের জন্য। এ দেখে কি করে বলা যায় গুহকের ঐ ব্রত ও সংকল্প কাল্পনিক? এটা জড় বিজ্ঞানের সন্তান অবিশ্বাসেরই দান।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম — শ্রীরাম গুহককে আলিঙ্গন করলেন কেন? এই দেখাতে — ভক্ত সব ভগবানের প্রিয়, যেমন পুত্র পিতার প্রিয়। ভক্তের দাম হয় না, অমূল্য বস্তু ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, ভক্ত মরলেও দাম লাখ টাকা, জীবিত থাকলেও লাখ টাকা — যেমন হাতী। ভক্ত সব ব্রাহ্মণ — ব্রহ্মকে জেনেছে যে! রামকে গুহক পরমব্রহ্ম বলে স্তব করলেন। কতখানি ভালোবাসা হলে সব ছেড়ে অগ্নি-প্রবেশ করতে যায়। রামেরও কত ভাবনা গুহকের জন্য। তবেই তো হনুমানকে পাঠিয়ে তাঁর ফিরে আসার সংবাদ দিলেন। চণ্ডীতেও এই কথা আছে — 'ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি'। তোমার আশ্রিতগণই জগতের আশ্রয় — দেবতারা দেবীকে বলছেন। ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, ঠাকুরের মহাবাক্য। দেখ না কবে গুহক-মিলন হয়েছে, আজও ভারতের ঘরে ঘরে সেইটি জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

পাঠ চলিতেছে। কর্মের কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর শ্যাম ডাক্তারকে বলিতেছেন, যখন 'ওঁ' বললে, হরিনাম বা রামনাম করলে পুলক হয় আর অশ্রুধারা পড়ে, তখন বুঝতে হবে আর সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মের প্রয়োজন নাই।

শ্রীম — প্রথম দিন এই কথা শুনেছিলাম। শুনে মনে হয়েছিল যেন হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে। আর হৃদয়ের জ্বালা দূর হয়ে গেল। উঃ কি জ্বালা—জ্বলন্ত অনলে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল। নইলে কেউ দেহত্যাগের সংকল্প করে? মানুষ কি বুঝবে এ লীলার? হৃদয়টি জ্বলন্ত অনলে জ্বালিয়ে এনে তাতে অমৃত ঢেলে দিলেন। Contrast-এ (বৈষম্য ভাবে) বস্তুর মূল্য বাড়ে। কোথায় মরণ আর কোথায় অমৃতত্বলাভ! সব প্রহেলিকা! স্বপ্নেও কি কখন ভেবেছিলাম, মন্দিরের পূজারী অমৃতত্ব দিতে পারে? কিন্তু তা আজ ধ্রুব সত্য। তাই ঠাকুর বারবার বলেছেন, শ, ষ, স। যে সয়, সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। এখন ভাবলে সব স্বপ্নের মত মনে হয়।

(একটু ভাবনার পর) ভগবান যে প্রেমময় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভক্তদের জীবন। তখন মাত্র একমাস ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি। কেশব সেনের বাড়ি কমল-কুটীরে ঠাকুর গেছেন। আমরা এসেছি। কেশববাবুর কাছে নালিশ করছেন কত আপনার লোকের মত। বলছেন, 'এই দেখ ইনি বলছেন

সংসারে মন লাগছে না। কিন্তু তবুও ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাচ্ছে না। তুমি একটু বুঝিয়ে বল না।' এসব মানুষ কি বুঝবে? যেন অনন্তকালের আত্মীয়। এই অলৌকিক ভালোবাসায় তিনি ভক্তদের কিনে ফেলেছিলেন চিরকালের জন্য। তখন মনে হতো, দক্ষিণেশ্বর যেন এ ঘর থেকে সে ঘর — পাঁচ মাইলের রাস্তা, তবুও। অবতার-লীলার প্রধান উপাদান এই প্রেমের ছড়াছড়ি। অহেতুক কৃপার বন্যা।

পাঠ চলিতেছে।

একজন ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) — টাকা-কড়ি বাড়াবার চেষ্টা সকলেই করছে। কেশব সেন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে।

ঠাকুর (বিরক্ত হইয়া) — কেশবের কথা আলাদা। যে সত্যিকার ভক্ত তার টাকা-কড়ি প্রয়োজন মত ঈশ্বরই দেন। সে চায় না, কিন্তু ঈশ্বর দেন। ভক্ত তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

শ্রীম — এখানে একটা কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন, 'যার কোন কামনা নাই সে সব স্থান থেকে ভিক্ষা নিতে পারে'। বলছেন, 'সত্যিকার ব্রাহ্মণ, হাড়ীর বাড়ি থেকেও ভিক্ষা নিতে পারে'।

আর বলছেন ঠাকুর, 'যে রাজার বেটা সে মাসোহারা পায়'। 'রাজার বেটা' মানে খাঁটি ভক্ত, যেমন কেশব সেন।

ঠাকুর বলছেন, 'উকীল-ফুকিলের কথা বলছি না যারা কষ্ট করে, লোকের দাসত্ব করে, পয়সা উপার্জন করে।' তাই উকীলের দেওয়া জিনিস খেতে পারতেন না। ডাক্তারেরও। বলতেন, বড় কষ্ট দিয়ে লোককে, টাকা উপায় করে। সাধারণভাবে যে উপার্জনে সত্য, দয়াদির অবমাননা না হয়, সে উপার্জনের ছাড়া অন্যের সেবা নিতে পারতেন না।

শ্রীম কিছুটা দীর্ঘকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটি ভক্ত (শ্রীম) বিচার করে, rationalist; ঠাকুর তার জন্য ব্যবস্থা দিলেন, বালকের মত বিশ্বাস। আবার বালকের মত ব্যাকুলতা। মায়ের জন্য পাগল। বললেন, 'এই ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। বিশ্বাস-ব্যাকুলতা-দর্শন — যেমন অরুণোদয়ের পর সূর্যোদয়।'

এর পরই তিনটি example (দৃষ্টান্ত) দিলেন। প্রথমটি, একটি

বালিকা বিধবা। বড় হলে বাপকে বলছে, আমার স্বামী কোথায়? বাবা? বাপ বললো, গোবিন্দ তোমার স্বামী। সে ঘরে শুয়ে গোবিন্দকে সরলভাবে ডাকছে। বলছে, গোবিন্দ তুমি এসো। সকলের স্বামী আসে তুমিও এসো। তার ব্যাকুল আহ্বানে গোবিন্দ এসে দর্শন দিলেন।

দ্বিতীয়টি, জটিল বালকের। ছোট ছেলে, স্কুলে যেতে ভয় পায় রাস্তায়। গরীব লোক, অন্য কেহ নাই। মা বলেছেন, যখন ভয় হবে তখন তোমার দাদা মধুসূদনকে ডেকো। সে এসে তোমায় স্কুলে পৌঁছে দেবে। একদিন খুব ভয় পেয়েছে আর ডাকছে ব্যাকুল হয়ে। ভগবান এসে পৌঁছে দিলেন স্কুলে।

আর তৃতীয়টি, বাপ বলেছে, ঠাকুরকে তুই আজ খাওয়াস্। আমি বাইরে যাচ্ছি কাজে। ভোগ দিয়ে বালক ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, ঠাকুর খাও। বাবা বলেছেন তোমায় খাওয়াতে। বালকের ব্যাকুলতা দেখে ঠাকুর সব ভোগ খেলেন।

কত পরিশ্রম ঠাকুরের ভক্তদের জন্য। বিচারশীলকে নিয়ে এলেন সহজ পথে, সরল বিশ্বাসের পথে। অবতারই মনকে ভেঙ্গে চূরে গড়ে দিতেন পারেন। শরণাগত, প্রভু শরণাগত!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১১ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা।

অষ্টম অধ্যায়

কর্তাগিরির অভাব মানে মা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। শীতকাল। আকাশ বেশ পরিষ্কার। অতি প্রত্যুষ সময়। সূর্য উঠিতেছে। শ্রীম পায়চারী করিতেছিলেন। হঠাৎ পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, টিনের ঘরের সামনে। পাশে বিনয়, গদাধর ও বুদ্ধিরাম। জগবন্ধু টিনের ঘরের দরজার সম্মুখে। শ্রীম বিস্মিত হইয়া কি যেন দর্শন করিতেছেন এই বাল-সূর্যের ভিতর। প্রায় পনের মিনিট নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তরাও সূর্য দর্শন করিতেছেন। কিন্তু শ্রীম-র অনুকরণ মাত্র। শ্রীম-র দর্শন সজীব ও আনন্দময়। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, প্রশান্ত ও সরস। একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন? নিশ্চয়ই ভগবানের কোন অলৌকিক ঐশ্বর্য দর্শন করিতেছেন — বিশ্বকর্মার বিচিত্র রচনা দর্শন হইবে! আবার ভাবিতেছেন — না, তাহারও উপর কিছু হইবে। হয় তো বিশ্বকর্মাকেই দর্শন করিতেছেন। নহিলে এমন সরস ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল কেন? ভক্তরা এইরকম অনুমান করিতেছেন। ইতিমধ্যেই শ্রীম বুদ্ধিরামের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — এই দেখ, (সূর্য ও আকাশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) কি কাণ্ড চলেছে। নিত্য দেখছি বলে কিছু মনে হয় না। আর বিষয়ভোগে মন ডুবে আছে বলে এসব দেখবার অবসর নেই, ভাববার শক্তি নেই। মা-ই এই সব রচনা করেছেন। ইনিই আবার মানুষের মনকে বিষয়ভোগে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাই মানুষ এসবে তাঁর হাত দেখতে পায় না। জগৎলীলা চলবে কি করে তা না হলে! সৃষ্টি-ফিষ্টি অচল হয়ে যাবে। তাই জগৎকে খেলনার মত সামনে ধরে রেখেছে — যেমন মা-রা শিশুর সামনে ধরে রাখে। শিশু তাই নিয়েই আনন্দ করে। মায়ের অবিদ্যা ডিপার্টমেন্টের কাজই এই — জীবকে দেহসুখে বেঁধে রাখা। যখন

এই সব আর ভাল লাগে না — বিয়েটিয়ে, দেহসুখ, নামযশ, বিদ্যার্জন, প্রভাবপ্রতিপত্তি, তখনই দৃষ্টি উল্টো দিকে যায় — তাঁর বিদ্যাশক্তির দিকে।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঠাকুর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকতেন। তখন বুঝতাম না, কেন। এখন তাঁর কৃপায় একটু বোঝা যাচ্ছে।

কখন দিগ্‌বসন হয়ে বিস্ময়ানন্দে নৃত্য করতেন। কখন গানের একটা পদ গাইতেন আর হাততালি দিয়ে নাচতেন — 'রঙ্গময়ী তোর রঙ্গ দেখে অবাক হয়েছি'। কখনও বলতেন, 'আমি কি বিচার করবো? দেখছি, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা, হাওয়া, জল, অগ্নি, বৃষ্টি, ফুল, ফল, মানুষ, পশুপক্ষী, এই সব।' উঃ, তাই একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) দ্বিতীয় দর্শনেই বলেছিলেন, 'তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। জীবজগৎ রক্ষার সব আয়োজন তিনি করে রেখেছেন। তুমি কেবল তাঁকে ডাক।' ভক্তরা তখন এইসব কথা অবাক হয়ে শুনতো, বুঝতে পারতো না এর মানে। এত দিনে তাঁর কৃপায় একটু বোঝা যাচ্ছে।

খালি কি তিনি এই সব করেছেন? তিনি নিজেই এই সব হয়েছেন। আবার এসবের ভিতরে বসে এসব চালাচ্ছেন। কি অদ্ভুত খেলা!

শ্রীম ছাদে-রাখা বেঞ্চে গিয়া বসিলেন। টিনের ঘরের পাশে উত্তরমুখী। ভক্তরা পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — বল দেখি, লোক কেন এসবে তাঁর হাত দেখতে পায় না? (নিজেই উত্তর দিতেছেন) — ভোগ নিয়ে আছে কি না, তাই দেখতে পায় না। ভোগ ত্যাগ হলে এসবে তাঁর হাত দেখতে পাওয়া যায়।

তোমার এসবে তাঁর হাত দেখতে ইচ্ছা হয়? যদি হয়, তবে ভোগ ত্যাগ করতে হবে। তা হলে হাততালি দিয়ে আনন্দে নেচে নেচে বেড়াতে পারবে। হুঁ, ভোগ ত্যাগ না হলে এসব দেখা যায় না।

২

এখন সকাল সাতটা। শ্রীম আসিয়া ছাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাদুরে

বসিয়াছেন। ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরা কেহ আছে, কেহ নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছে। এক ঘন্টা ধ্যানের পর উপনিষদ্ খুলিয়া পড়িতেছেন, বৈদিক গুরু-গম্ভীর সুরে — কখনও অনুচ্চ, কখনও উচ্চস্বরে।

শ্রীম — হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ (ঈশ ১৫)
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতি বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (কেনো)
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (কঠো ২:৩:৩)
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাতপ্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ॥ (কঠো ২:৩:১৮)

শ্রীম ঈশ, কেন ও কঠ, তিনটি উপনিষদ্ হইতে বাছিয়া অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করিলেন। এখন ঐসব মন্ত্রের ভাবার্থ বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সমগ্র বিশ্ব ছেয়ে আছেন ঈশ্বর। ঋষিরা তা অনুভব করেছিলেন, পরে দর্শন করেছিলেন। ঋক্‌বেদে সূর্য অগ্নি পবন ইন্দ্র — এসব দেবতার স্তুতি রয়েছে। এ দেখে কেউ কেউ বলেন, এসব প্রকৃতি উপাসনা। তা নয়। ঠাকুর দেখেছিলেন কাপড়ের টানা-পোড়েনের মত মা এই জগৎ জুড়ে রয়েছেন। প্রকৃতির, nature-এর প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বেছে নিয়ে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের স্তব এসব। এই সব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অন্তর্যামীরূপে ভগবান রয়েছেন। তিনিই তাঁদের চালিত করছেন। তাঁরই ভয়ে শাসনে, অগ্নি, সূর্য, মেঘ, বায়ু, মৃত্যু সব আপন আপন কাজ করছে। মানে এসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের, কর্মচারীগণের হৃদয়ে বসে তিনি এঁদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন — ঠিক যেমন মনুষ্যলোকে রাজার ভয়ে সকল কর্মচারীরা কাজ করে। এই অনন্ত বিশ্ব চলতে পারে না ঈশ্বরের শাসন ছাড়া। একটা পরিবার চলে না একজন প্রধানের সাহায্য ছাড়া।

ভোগে ডুবে থাকলে এসবে তাঁর হাত দেখা যায় না। তখনই বলে প্রকৃতির শক্তিতে এই সব হচ্ছে। এ প্রশ্ন করে না, প্রকৃতি — nature, এই শক্তি পেল কোত্থেকে? তাই বেদে এই শ্রেণীর লোককে 'মূঢ়াঃ'

'অন্ধাঃ' বলেছেন। আর যারা এই অন্ধদের পরামর্শে চলে তাদের অবস্থা হয়, এক অন্ধ আর অন্ধকে চালিত করলে যেমন উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয় — ঠিক ঐরূপ বিনষ্ট হয়। আর যারা ঋষিদের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, সংসারে চলে, তাদের অমৃতত্ব লাভ হয়। আর জন্মমরণ হয় না। Law of Causation-এর, মায়ার রচিত জন্মমরণ চক্রের বাইরে অমৃতময় আনন্দময় ধামে অবস্থান করে মৃত্যুর পরে এবং এই জীবনেও। তাদের কর্তাগিরি ঘুচে গেছে। পারাপারের এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন বিনাশের কর্তার কর্তাগিরির সঙ্গে মিশে গেছে। এই 'কর্তা'-টাই যত গোল বাধায়। তাই ঋষিরা প্রার্থনা করছেন, সূর্যের ভিতর ঈশ্বরের রূপটি দেখার অভিপ্রায়ে — তোমার মুখের আবরণটি টেনে নাও, দর্শন দাও। ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা পরদা না সরালে তাঁর দর্শন হয় না।' একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন, 'তোমার আর ভয় নাই। মা টেনে নিয়েছেন।' প্রথমে প্রার্থনা করলেন, 'এর ভার তোমার উপর দিলাম। তোমার ইচ্ছা তাকে দর্শন দেওয়া, না দেওয়া।' আর একবার বলছেন, 'মা অত করে বললাম, তোর ভুবনমোহিনী রূপটি একবার দেখা। তুই তো ইচ্ছাময়ী, কারো কথা শুনবি না। মা, এ তোর কাছে দীনহীনভাবে বসে থাকে। দেখাও মা।' তারপর দেখালেন। তখন বলছেন ঐ কথা — তোমার আর ভয় নাই। মা টেনে নিয়েছেন।

ঠাকুর না এলে আমাদের কাছে উপনিষদের এই সব কথা, কথার কথা হয়ে থাকতো। তিনি নিজের জীবনে বেদ, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেছেন এক বা আধবার নয়, সর্বদা — চব্বিশ ঘণ্টা। আমরা watch (সজাগ পরীক্ষার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ) করেছিলাম ঠাকুরকে চব্বিশ ঘণ্টা দেখতে, যদি বা কখনও ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু হন নাই। রাত্রিতে শুয়ে আছেন আর, 'মা মা' করছেন। নিদ্রা তাঁর খুব কমই ছিল। একসঙ্গে পনের মিনিট, খুব জোর আধ ঘণ্টা।

ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন তাঁর মুখ দর্শন করাতে। এতেই মনে হয় এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বে দর্শন করেছেন। আর কেউ নূতন দর্শনপ্রার্থী। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে দর্শন করেছেন তার প্রমাণ তাঁদের উক্তি। কেমন সুন্দর উপমা — মুঞ্জা থেকে ইষীকা অর্থাৎ কুশদণ্ডের উপরিভাগে

লম্বা একটা ডাণ্ডা থাকে। সেটা সাদা ফুলে ঢাকা থাকে। ছেলেরা ঐ ফুলওয়ালা অংশটা টেনে বের করে নেয় — বেশ ঝাড়নের মত ঐটি। বর্ষাকালে ঐ কুশ খুব বাড়ে। তখন ঐ ফুল হয়। ঠিক ফুলের ঝাড়নটা যেমন টেনে বের করে নেয় কুশদণ্ড থেকে পৃথক করে, ঠিক তেমনি পরমাত্মাকে, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরাধিষ্ঠিত জীবাত্মারূপী কুশবৃক্ষ থেকে, টেনে বের করে নেওয়া। শরীর আলাদা, পরমাত্মা আলাদা, বুদ্ধিতে এই ভাবটা আরূঢ় করিয়ে তারপর চেষ্টা করা 'ধৈর্যেণ' অর্থাৎ ধৈর্যের সহিত। কেমন ধৈর্যের সহিত? ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, যেমন তৃষ্ণার্তের কূপ খনন করা জলের জন্য।

একজনের জল চাই। সে মাটি খুঁড়ছে। একস্থানে পাথর বের হলো। এটা ছেড়ে দিয়ে আর একস্থানে খোঁড়া শুরু করলো। এখানে বের হলো কয়লা। এইরকম নানা স্থানে খোঁড়ে আর বাধা দেখলে ছেড়ে দেয়। তার কূপ-খননও হলো না, জলপানও হলো না। তৃষ্ণায় প্রাণ গেল। এই দুর্লভ মানব-জন্ম বিফলে গেল। আর একজন, পাথর পড়লো তবুও ছাড়ছে না। ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন ঐ পাথরই কাটছে। শেষে তার ভিতরের ছিদ্র দিয়ে শীতল স্বচ্ছ জল বের হলো। অর্থাৎ, এই শরীরেই আত্মদর্শন করলো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — Intellectually (বুদ্ধি দিয়ে) এ বোঝে অনেকেই। কিন্তু পাথর ভেঙ্গে জল আনতে পারে না। ঠাকুর এসে এইটেতে জোর দিয়েছেন। নিজের জীবনে কঠোর সাধনা করে জল এনেছেন। সেই জল আমাদের দিয়েছেন। আর জগতের অপরের জন্য রেখে গেছেন। কথাটা হচ্ছে বিষয়ভোগ ছাড়তে হবে। একথা শুনলেই লোক পালায়। ঠাকুর পাকা শিক্ষক। ভক্তদের ভালবাসা দিয়ে বেঁধে, ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিতেন। হাবুডুবু করছে প্রাণপণে, দেখলে কোলে টেনে নিতেন। কর্তাগিরিটা অবশ হলেই সামনে মায়ের শান্তিময় কোল।

৩

আর্যসমাজ মন্দির। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাতে অবস্থিত। ঠিক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত ফুটে। শীত কাল। এখন রাত্রি ছয়টা

বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম সমাজমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেঞ্চে বসিয়া আছেন উত্তর দিকের তৃতীয় দরজার পশ্চিম পাশে। সঙ্গে জগবন্ধু, গদাধর, একজন ভক্ত শিক্ষক, প্রভৃতি। মর্টন স্কুল হইতে আসিবার সময় শ্রীম ঠনঠনিয়ার মা কালীকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীম মধুকরের ন্যায় সকল ধর্ম মন্দিরে যান ব্রহ্মমধু আহরণের জন্য। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বৌদ্ধবিহার, জৈন মন্দির, সর্বত্র তাঁহার গতি। তিনি বলেন, ঠাকুর এমন একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন যে সকল ধর্মের লোককেই আপন মনে হয়। ঠাকুরের মহাবাক্য — 'যত মত তত পথ' — তিনি হাতে আনিয়াছেন। আজের পালা আর্যসমাজ। আরও বিশেষ আকর্ষণ, আজ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ প্রতীচীর বাগ্মী-প্রধান মনীষী স্বামী অভেদানন্দ। ইনি বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই ও সহযোগী। আমেরিকার চিকাগো বিশ্বধর্ম সভায় স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের বিজয়দুন্দুভি নিনাদে সমগ্র জগতবাসীকে স্তম্ভিত করেন। বেদান্তের ঐ বিজয়দুন্দুভির নিনাদ অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি ভারত হইতে ডাকিয়া আনেন কঠোর তপস্যারত 'কালীতপস্বী'-কে। ইনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রাণপাত করিয়া ঐ বেদান্তনিনাদ প্রতীচীতে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর যাবৎ স্বদেশে ফিরিয়া বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজ এই সমাজমন্দিরে তাঁহার বক্তৃতা হইবে। বিষয় — 'ধর্মসমন্বয়ে বেদান্ত'।

শ্রীম তাই অতি আগ্রহে আসিয়াছেন গুরু-ভাইয়ের মুখে ঠাকুরের বাণী শুনিবেন বলিয়া। শ্রীম বলেন, সকল প্রণালী দিয়ে একই জল নির্গত হয়। প্রণালীর আকার খালি ভিন্ন ভিন্ন। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজেও তাই যান। শ্রীকেশবও একটি প্রণালী।

স্বামী অভেদানন্দ আসিলেন সাতটার সময়। বক্তৃতা এক ঘন্টা। তিনি বক্তৃতামঞ্চে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, কথামৃতকার বিনয়মূর্তি শ্রীম প্রায় সকলের পশ্চাতে বেঞ্চে উপবিষ্ট। তিনি উঠিয়া আসিয়া শ্রীমকে সাদরে জোর করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে বসাইলেন। শ্রীম স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিতে বড় ভালবাসেন। বেদান্ত সোসাইটি দূরে। তাই নিজে যাইতে পারেন না বার্ধক্যের জন্য। এজন্য অন্তেবাসীকে সর্বদা

পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহার রিপোর্ট শুনিয়া আনন্দ করেন। বলেন, একই গঙ্গার জল, 'তপ্ত জীবন'। পানে সদ্য মুক্তি। প্রণালী ভিন্ন। স্বামী অভেদানন্দ এইবার বক্তৃতা দিতে উঠিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ — বেদান্তের ধর্মসমন্বয় অতি প্রাচীন। ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটিই তার প্রমাণ। ঐতিহাসিকগণ বলেন, জগতের প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ। মন্ত্রটি এই — 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' এর অর্থ — ভগবান এক। কিন্তু ভগবদ্‌দ্রষ্টাগণ নানা নামে তাঁকে অভিহিত করেন। এ ভাবটি সর্বদাই ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। বেদ পুরাণ তন্ত্র এই প্রতিধ্বনি বহন করে। অবতার ও মহাপুরুষগণের বাণীতে সর্বদা এই ভাবটি বিদ্যমান। গীতাতে আছে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।' (গীতা ৪:১১)। সব মানুষ নানা পথ দিয়ে গিয়ে আমাকেই অনুসরণ করে। আবার আছে, 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাতিমুখা দ্রবন্তি।' (গীতা ১১:২৮)। সব নদীর সমুদ্রে গতি। শিবমহিম্ন স্তবে আছে — 'ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং গৃণামে কোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।' সকল লোক তোমারই উপাসনা করে, যেমন সকল নদীর আশ্রয় সমুদ্র।

বর্তমান সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যটি পুনরায় আবিষ্কার করেছেন নিজ জীবনের সাধনার ভিতর দিয়ে। তাঁর মহাবাণী, 'যত মত তত পথ। মত পথ।' যেমন একই পুষ্করিণীর জল সকলে নিচ্ছে। কিন্তু আসার সময় রাস্তায় ঝগড়া করে বলছে, আমি জল নিতে যাচ্ছি। আর একজন বলছে, আমি পানির জন্য যাচ্ছি। আর একজন বলছে, ওয়াটার ইত্যাদি। পুকুরে নেমে দেখছে, সকলেই কলসীতে একই বস্তু নিচ্ছে। ঝগড়া বৃথা। ঠাকুর আর একটি উপমা দিয়েছেন। কতকগুলি অন্ধ এক স্থানে বসে হাতীর রূপ বর্ণনা করছে। কেহ বলছে, হাতী একটা থামের মত। কেহ বলছে, তা কেন হবে, হাতী কুলোর মত। এইরকম বলে মহা ঝগড়া। একজন চক্ষুষ্মান লোক এসে বললো, এ সবই একই হাতীর বিভিন্ন অঙ্গ।

কেন করলেন ঠাকুর এইসব সাধনা — হিন্দুর বেদ পুরাণ তন্ত্রের সাধনা? খ্রীস্টান ও ইসলাম মতের সাধনা? এই দেখাতে — সকলেই

এক ঈশ্বরকেই ডাকছে নানাভাবে। ধর্ম নিয়ে বিবাদ বৃথা। সব ধর্মই এক একটি পথ ঈশ্বরপ্রাপ্তির। পথ ঈশ্বর নয়। পথ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু, সব পথেরই গন্তব্য স্থল ঈশ্বর।

এ সময়ে এই সমন্বয়ের বড়ই দরকার। বিজ্ঞানের প্রভাবে সমগ্র জগৎ একটা দেশ বা এক পরিবারের মত হয়ে গেছে। যদি মূলে সাম্য, এক না থাকে বিবাদ প্রবলতর রূপ ধারণ করবে। তাই ঠাকুরের এই কঠোর সাধন। মানুষের একটা পথে যেতেই সারা জীবন যায়। আর তিনি তিন তিন দিনে এক একটা মতের সাধন করে বললেন, 'মত পথ'। শান্ত হও, ভাই-ভাই এর মত মিলেমিশে থাক। এতে সকলেরই কল্যাণ।

এখন সাড়ে আটটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের ছাদে আসিয়া বসিয়াছেন। অনেক ভক্ত তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমরা কালী মহারাজের বক্তৃতা শুনে এলাম। বহুদিন পর শুনলাম। বড় সুন্দর হলো। আহা, ঠাকুর কি দাগ হৃদয়ে লাগিয়ে দিয়েছেন, এঁদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর কথা মুখ থেকে অনর্গল বের হচ্ছে। ঠাকুর একটা গল্প বলতেন। একজন হিন্দু মুসলমান হয়েছে। আল্লা নাম বলতে গিয়ে বের হয় মা দুর্গার নাম, কালীর নাম। ওরা বলছে, আল্লা বল। সে বললে, চেষ্টা তো তাই করছি। কিন্তু কি করি, মা কালী যে গলা তক্ ঢুকে আছে (হাস্য)। অতদিন ওদেশে থেকেও ঠাকুরই ঢুকে আছেন হৃদয় মনে। আজ বক্তৃতায় বড় আনন্দ হল। আপনারা যান নাই কেন? পাশ্চাত্ত্যে পঁচিশ বছর থেকে এলেন, কিন্তু মনে পাশ্চাত্ত্যের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে কেবল রামকৃষ্ণ। এঁদের দেখলে ঠাকুরে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

রাত্রি প্রায় দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ।
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ ১৯ দণ্ড। ৩৫ পল।

নবম অধ্যায়

শ্রীম ও রাজর্ষি মনীন্দ্র নন্দী — বুদ্ধবিহারে

১

মর্টন স্কুল। ডিসেম্বর মাস। এখন অপরাহ্ন সওয়া তিনটা। শ্রীম ছাদে রৌদ্রে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। সম্মুখে শনিবারের ভক্তগণ — ললিত রায়, 'ভবরাণী' প্রভৃতি। ইঁহারা ভাটপাড়া অঞ্চলের, আসেন প্রতি শনিবার অফিস ছুটির পর। ভোলানাথ মুখার্জী দর্শন করিতে আসিলে শ্রীম তাঁহাকে প্রায়ই বলেন, মুখুয্যে মশায়, আপনার ঐ গানটা একবার হোক না। গানের ভাবার্থ এইরকম — 'মা জগদম্বা, এখানে আমায় আনিয়ে কি দুর্ভাবনাই ভাবাচ্ছ। আমার সাধন ভজন কিছুই নাই। তাই দিবানিশি বিষয়রূপী বিষপান করে তার জ্বালায় প্রাণ যায় যায়।' গানের প্রথম পদটি এইরূপ — 'কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে আনিয়ে এ ভবে ভাবালে আমায়।' ভক্তগণ তাই আদর করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছেন 'ভবরাণী'। আজও তিনি ঐ গানটি গাহিয়াছেন।

ডাক্তার বক্সী ও বিনয়ের প্রবেশ। তাঁহারা কাশীপুরের বাসা হইতে আসিয়াছেন। গতকাল স্থির হইয়াছিল, শ্রীম ডাক্তারের মোটরে কপালীটোলার বুদ্ধবিহারে যাইবেন উৎসবে যোগদান করিতে। আজকাল প্রায়ই নানা ধর্ম মন্দিরে উৎসব দর্শন ও ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতে যান। গতকাল আর্যসমাজে গিয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রবচন শুনিতে। কয়েকদিন পূর্বে গিয়াছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজে। আরও কিছুদিন পূর্বে এই কপালীটোলার বুদ্ধবিহার দর্শন করিয়াছিলেন। তখনও উৎসব ছিল। ঐ দিনই যান ধর্মতলার মেথডিস্ট চার্চে। কখনও জৈন ভক্তদের বিখ্যাত পরেশনাথের মন্দিরে যান। কখনও বৈষ্ণবদের গৌড়ীয় মঠেও যান। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, হ্যারিসন রোড ও মেছুয়াবাজারের গুরুদ্বারা, আমহার্স্ট স্ট্রীটের মসজিদ ও সেন্ট পল

কেথিড্রল — এই সকল ধর্মস্থানে শ্রীম সর্বদা যাতায়াত করেন — কখন ভক্তসঙ্গে, কখন একাকী। কখন বলেন, কলকাতা শহরের সকল ধর্মোপাসনা একসঙ্গে দর্শন করতে ইচ্ছা হয়। ইহা তো সম্ভব নয়। তাই একদিনে কয়েকটি ধর্মস্থান দর্শন করেন। একই ভগবানকে নানা জনে নানা ভাবে ডাকছে। কখন ভক্তদের দিয়া এজেন্সি সংগঠন করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে পাঠান। আর তাহাদের মুখে সব ধর্মপ্রসঙ্গ শোনেন। শ্রীম বলেন, ঠাকুর কৃপা করে এমনি একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন চোখে, তাতেই সব লাল দেখি, সবকে আত্মীয় বলে বোধ হয় সব আপনার জন। যেমন, সদাশয় কোনও গৃহাশ্রমী নিত্য বা প্রায়ই আপন আত্মীয়কুটুম্বদের বাড়ি বাড়ি যাইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দিত হয়, তেমনি শ্রীম-র অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-র গুরুদেব। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীম এই কথা ভক্তদের বলেন। আরও বলেন, এই শ্রীরামকৃষ্ণই — হিন্দুদের রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য; শিখদের গুরু নানক; জৈনদের পরেশনাথ, মহাবীর; বৌদ্ধদের বোধিসত্ত্ব; খ্রীস্টানদের ক্রাইস্ট; মুসলিমদের মহম্মদ। তাই সকল ধর্মীই শ্রীম-র আত্মীয়, আপনজন।

শ্রীম ডাক্তারের মোটরে বসিয়া কপালীটোলা বুদ্ধবিহারে গমন করিলেন। ভক্তগণ পদব্রজে আগেই রওনা হইয়া গিয়াছেন — বিনয় ছোট রমেশ, গদাধর, বুদ্ধিরাম ও জগবন্ধু। তারপর গেলেন ছোট জিতেন, ছোট নলিনী, ভোলানাথ ও মনোরঞ্জন। রমণী ও 'ব্রুকবণ্ড' (যতীন) পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছেন।

কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী আসিয়াছেন। শ্রীমকে দেখিয়া অতি আহ্লাদে তাঁহার নিকট আসিয়া নমস্কার করিলেন। আর কুশল প্রশ্ন পরম আত্মীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মহারাজা (শ্রীম-র প্রতি) — আপনাদের শরীর যত বেশী দিন পৃথিবীতে থাকে ততই আমাদের কল্যাণ। একে একে তো সকলেই বিদায় নিচ্ছেন। এখন বুঝি আপনারা কয়জন আছেন — শিবানন্দ মহারাজ, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ। অখণ্ডানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় ওখানে সারগাছিতে।

শ্রীম — সারগাছির আশ্রম তো আপনার ঐকান্তিক সেবায় বেশ কাজ করছে।

মহারাজা — অখণ্ডানন্দ মহারাজের কৃপা আছে। আর কে কে রয়েছেন যাঁরা ঠাকুরের কাছে বসেছিলেন?

শ্রীম — সারদানন্দজী, সুবোধানন্দজী, নির্মলানন্দজী, আর ছিলেন এলাহাবাদের উনি — বিজ্ঞানানন্দজী।

মহারাজা — অভেদানন্দজী তো বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেশ কাজ হচ্ছে। আমেরিকায়ও দীর্ঘকাল প্রচার করেছেন। ওদেশের কাজে ভারতের বড় উপকার হচ্ছে। ওদেশের লোকদের তো হচ্ছেই। স্বামীজীই (স্বামী বিবেকানন্দ) ওদেশে গিয়ে ভারতের বেদান্তের বাণী শোনান। ওরা তাতেই এ দেশের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারেন। ম্যাক্সমুলার খুব প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি ভারতের একজন একনিষ্ঠ হিতৈষী।

আর আপনার 'কথামৃত' এদেশে অমৃত গঙ্গার বান এনেছে। ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। কথামৃত না থাকলে আমরা ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনের কথা জানতেই পারতাম না। ঠিক যেন ফটোগ্রাফ! শাস্ত্রের সকল তত্ত্বের সমাধান অত সহজ ও সুললিত ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থে নাই। পড়বার সময় বুদ্ধি অযথা পিষ্ট হয় না। বালকও বুঝতে পারে। যতবার পড়া যায় সব নূতন মনে হয়। অমর গ্রন্থ — রামায়ণ মহাভারতের মত ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে।

শ্রীম (বিনীতভাবে) — এ সবই ঐ বাজীকরের খেলা। মানুষের বাহাদুরী নাই এসবে। যাঁর হাঁ-তে 'হাঁ' হয়, না-তে 'না' হয় — এসবই তাঁর লীলা। তাঁরই মহামায়া আমাদের সংসারে ফাঁসিয়েছেন। আবার তিনিই যুগে যুগে এসে মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে যান। তবে ঐ রাস্তা ধরে আনন্দধামে যেতে পারে, এখানেও আনন্দে থাকে। এই যাঁর জন্য আমরা সকলে এখানে এসেছি তাঁরই কথা ভেবে দেখুন না! কি আশ্চর্য ব্যাপার, আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে তাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি। তাঁর শরীরের এক টুকরো অস্থি এসেছে এখানে, তার টানে সব এসেছে, উৎসব করছে। এতেই তাঁরই সেই মহিমময় জীবনের কথা আমরা ভাবছি। সংসারে

তো আনন্দ নাই। তাই তাঁর জীবন, তাঁর বাণী শুনে লোক আনন্দ করে।

মহারাজা — এই অস্থি ভারত গভর্নমেন্ট দিয়েছেন। এর ওপর মন্দির হবে।

শ্রীম এইবার সমগ্র বিহার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আশ্রমের মহন্ত বৃদ্ধ স্থবির শ্রীমকে সঙ্গে করিয়া সব দর্শন করাইতেছেন। কিছুদিন পূর্বেও ঐ অস্থি-র উৎসব হইয়াছিল। শ্রীম তখনও আসিয়াছিলেন। আজের উৎসব মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে।

সন্ধ্যা হয় হয়। ভক্তগণ মর্টন স্কুলে পদব্রজেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম মোটরে ইতিপূর্বেই ফিরিয়াছেন। দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন! আর ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ভক্ত ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না। বলেন, জল ছাড়া মাছের যে অবস্থা হয়, আমাদেরও সেই দশা। এটা বুঝেছি একবার অসুখে। ডাক্তার কথা বলা বন্ধ করে দিছলেন। তাতে প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। ভক্ত ডাক্তার সত্যশরণ কথা বলতে অনুমতি দেন। যেই ঠাকুরের কথা বলতে আরম্ভ করলাম অমনি জ্বর ছেড়ে গেল। এক মাস ভুগেছি কথা বন্ধ করায়, জ্বর ছাড়ে নাই। তাই বলে কথামৃত। অমৃত যেমন অমর করে, ভগবানের কথারূপী অমৃতও সেইরূপ অমৃতত্ব প্রদান করে। মন প্রসন্ন থাকলে শরীরের ব্যাধিও চলে যায়।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি কাণ্ডখানাই না তিনি করেছেন। একদিকে তাঁর অবিদ্যামায়া লোককে মায়ায় বাঁধছে, আর একদিকে বিদ্যামায়া মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। যুগে যুগে তিনি অবতার হয়ে আসছেন। এসে ভক্তদের মুক্তির সন্ধান বলে দিচ্ছেন, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। আজ ওখানে এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। কবে এসেছিলেন আড়াই হাজার বছরের বেশী হল। আজও লোক তাঁকে ধরে শান্তি আনন্দলাভ করছে।

ঠাকুর এইমাত্র সেদিন চলে গেছেন। তাঁর শীতল স্পর্শ হাওয়া বহন করছে। সকলে তা ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। মন অপরিষ্কার বিষয়বাসনায়। কত ধাক্কা খাচ্ছে। দর দর করে রক্ত পড়ছে তবু উট কাঁটা-

ঘাস খাওয়া ছাড়ে না। ঠাকুর সর্বদা অবিদ্যার এই খেলা দেখতেন। তাই জীবের ভাব আরোপ করে প্রার্থনা করতেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না'। তাই সর্বদা শরণাগত।

একজন ভক্ত — কাঁটা ঘাস খাওয়াতেও তো আনন্দ আছে।

শ্রীম — হাঁ, তা বটে। তবে ক্ষণিক আনন্দ। এর পরই দুঃখ। বিষয়ভোগে এই সুখ, এই দুঃখ। সুখে আনন্দ, দুঃখে নিরানন্দ। যদি বল, বিষয়সুখের আনন্দ নিয়ে থাকা যাক্ — তার উত্তর ঐ আনন্দ স্থায়ী হয় না। আর একটা বিষয়ভোগ করার ইচ্ছা এসে পূর্বের আনন্দটাকে ভুলিয়ে দেয়। বিষয়ের ধর্মই এই। এইরূপ বহু জন্ম সুখ দুঃখ ভোগ করে মন একটানা আনন্দ চায়। তখন ঈশ্বরকে খোঁজে। তখন বোঝে ব্রহ্মানন্দ চিরকাল স্থায়ী। যথার্থ ঈশ্বরভক্তের হৃদয়ে আনন্দ থাকে, বাইরে যতই সুখ দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেলিত হোক না কেন।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ কেবল বুদ্ধদেবের কথাই মনে উঠছে। স্ত্রী পুত্র, মা ভাই, রাজ্য সুখ, সব ছেড়ে ভিক্ষু হলেন। পিতা গৃহে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁরও মন বিষয়বাসনা বিবর্জিত হলো। সমগ্র পরিবারই ত্যাগের রঙে রঞ্জিত। আহা, কে গো তিনি, যার সংস্পর্শে এটি হলো? লোকে দুটি পয়সা ছাড়তে চায় না। আর, এ মনে কর রাজ্য!

প্রথম ভিক্ষু হলেন বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভাই। তারপর খুড়তুতো ভাই দেবদত্ত, বুদ্ধের ক্ষৌরকার উপালি আর দার্শনিক অনিরুদ্ধ। কয়েক বছর পর অপর খুড়তুতো ভাই আনন্দও ভিক্ষু হলেন। এই আনন্দই ছায়ার মত বুদ্ধদেবের সেবা করেছিলেন ত্রিশ বৎসর ধরে। ইনিই বুঝি 'বিনয় পিটক'-এর লেখক।

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধনও নির্বাণ লাভ করেন মৃত্যুর পূর্বে। সংবাদ পেয়ে বুদ্ধদেব পিতার রোগশয্যার পাশে বসে তাঁকে নির্বাণের জ্ঞান ও পরমানন্দ প্রদান করেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রাজপ্রাসাদের দৃশ্য বড়ই করুণ। উনি শহরে ভিক্ষা করে সশিষ্য প্রাসাদের সামনের বাগানে বসে খাচ্ছিলেন। তখন তাঁর পুত্র রাহুলকে রাজবেশে সাজিয়ে জানালা দিয়ে দেখিয়ে তার মা

বললেন, ঐ তোমার পিতা বাগানে বসে খাচ্ছেন। তুমি গিয়ে তোমার উত্তরাধিকার চাও। তোমার পিতা অতুল ঐশ্বর্যের মালিক। বুদ্ধদেব সাতদিন মাত্র কপিলাবস্তুতে বাস করছেন। রাহুলের বয়স মাত্র সাত বৎসর। বালক গিয়ে নির্ভয়ে ও সস্নেহে বলল, পিতঃ! আপনার ছায়াতলে দাঁড়িয়ে থেকে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে। ভোজন সমাপ্ত করে উনি বালককে স্নেহাশিস্ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু রাহুল পিছু পিছু যাচ্ছে। তাই দেখে তিনি সারিপুত্রকে বললেন ছেলে উত্তরাধিকার চাইছে। আমি তো তাকে দুশ্চিন্তা ও দুঃখের আকর নাশবান ধন দিতে পারি না। আমি তাকে পরম শান্তি ও পরমানন্দের খনি সন্ন্যাস প্রদান করব।

এই বলে বালককে বললেন — বাছা, আমার ধনরত্ন কিছুই নাই। আছে কেবল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। তুমি যদি ইহা নিতে চাও আর পালন করতে পার তবে তোমাকে উহা দিব। ভেবে দেখ, তুমি কি ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করে, ভিক্ষুদের মত সারা জীবন পরমানন্দ পরমসুখ লাভে অতিবাহিত করতে পারবে? বালক দৃঢ় স্বরে বলল, নিশ্চয় পারব। আমাকে ভিক্ষুসঙ্ঘে অভিষিক্ত করুন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সিংহশিশু! জীবন্ত ড্রামা! পিতা পুত্রকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত না করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাসব্রতে অভিষিক্ত করেন। ভারতের ইতিহাস এই। উপনিষদের ভিক্ষু ব্রহ্মজ্ঞ বালক নচিকেতা, সত্যকাম। ঐতিহাসিক যুগের রাহুল। শংকরাচার্যও পাঁচ বৎসর বয়সে সন্নাসী। Upanishad repeats itself (উপনিষদের আবির্ভাব যুগে যুগে)।

৩

ছোট জিতেন শ্রীমর অনুমতি লইয়া রাণাঘাটের বাড়িতে রওনা হইলেন। সঙ্গী হইলেন ছোট নলিনী। শ্রীম উঠিয়া আসিয়া একটি ভক্তের কানে কানে বলিলেন, ডাইং য়্যাণ্ড ক্লিনিং থেকে কাপড় আনতে হবে যে।

কিছুকাল পূর্বে বেলুড় মঠে 'যাজ্ঞবল্ক্য' নাটক অভিনীত হইয়াছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অবলম্বনে। সাধুরাই নট ও নটী সাজিয়াছিলেন। উহা বড়ই impressive (চিত্তাকর্ষক) হইয়াছিল। শ্রীম নিজে যাইতে পারেন

নাই। কিন্তু ভক্তদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে ঐ কথা শুনিয়া অবধি কথামৃত ড্রামাটাইজের (অভিনয়ের) কথা ভাবিতেছেন। ইতিপূর্বেও অনেকবার মাঝে মাঝে কথামৃত অভিনয়ের কথা হইয়াছে। আজ আবার সেই কথা উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া বুদ্ধলীলাপ্রসঙ্গে জীবন্ত নাটক রাহুলের সন্ন্যাসগ্রহণ স্মরণে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, (এই কথামৃত) লিখবার সময় ঐ (অভিনয় করা) উদ্দেশ্য ছিল। তা হলে মনে গেঁথে যাবে যারা পড়বে, মুখস্থ করবে।

চৈতন্যদেব সবে চলে গেছেন। ভক্তরা শোকে অধীর। তখন করেছিলেন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' — না? কি জানি।

আপনারা এটা (কথামৃত অভিনয়) mature (কাজে পরিণত) করতে পারেন তো বেশ হয়।

শ্রীম নীরব ক্ষণকাল, পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মঠে যাজ্ঞবল্ক্য হয়েছিল, সে সংস্কৃতে। আর এ বাংলায়। একেবারে মনে গেঁথে যাবে।

যাজ্ঞবল্ক্যে বৈদিক যুগের একটা আভাস পাওয়া যায়। প্রথমটা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ডের খুব প্রবর্তন হয়। শেষের দিকে জ্ঞানকাণ্ডের প্রভাব বাড়ে। এই যুগেই উপনিষদ্ forefront-এ (প্রাধান্যে) আসে। বেদে দুই কাণ্ডই আছে — কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য স্বর্গাদি লাভ। জ্ঞানকাণ্ডের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান। এটি চায় মানুষ যখন সংসারভোগে আলুনি লাগে। স্বর্গাদি ভোগ ও সংসারভোগ, অনিত্য। স্বর্গাদি থেকে মর্ত্যলোক আসতে হয় ভোগের সমাপ্তিতে। এইরূপে বহুবার জন্ম-মৃত্যু-চক্রে পড়ে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই মন চায় একটা permanent (স্থায়ী) স্থান। মানুষ যেমন ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, বিশ্রাম চায় তখন। বিশ্রাম করে শান্ত হয়ে আবার চলে। জীবাত্মাও এইরূপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বারবার জন্মে, বারবার মৃত্যুতে। তখন চায় স্থায়ী স্থান, নিত্যস্থান — অর্থাৎ ভগবানকে। ছোট ছোট ভোগে আলুনি লাগে তখন। অর্জুনকে তাই বললেন শ্রীকৃষ্ণ, মনেপ্রাণে ভগবানের শরণ নাও। তা হলে তাঁর কৃপায় 'পরাং শান্তিং' লাভ করতে পারবে। আর ঐ সঙ্গে লাভ হবে,

শাশ্বত স্থান — 'স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্'। চিরস্থায়ী শান্তি, আর চিরস্থায়ী বাসস্থান কেবল ভগবানের কাছে মিলে। উপনিষদ্ এই বার্তা বহন করে।

একজন ভক্ত — পূর্ব-মীমাংসার মতে তো কর্ম দ্বারাই মুক্তি?

শ্রীম — হাঁ, বেদান্তীরা তা' মানে না।

ভক্ত — বেদান্তী বলতে কাদের বোঝায়?

শ্রীম — বেদান্ত শব্দের অর্থ, বেদের অন্ত ভাগে যা আছে। অর্থাৎ উপনিষদ্। বেদের দুটি অংশ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডই বেদের প্রায় সব অংশ জুড়ে রয়েছে। জ্ঞানকাণ্ড সংক্ষিপ্ত। বেদের নাকি বার শত শাখা ছিল । প্রত্যেক শাখাতে শেষের দিকে একটি উপনিষদ ছিল। সবই প্রায় লুপ্ত এখন। যে কয়টি উপনিষদ্ এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে শংকরাচার্য দশটিকে প্রধান বলেছেন। তাদেরই ভাষ্য লিখেছেন। আরও ছয়টির reference (উল্লেখ) আছে ঐ ভাষ্যে।

এই সকল উপনিষদের ভাষ্য রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্য লিখেছেন। শংকরের মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলে। রামানুজ ও মধ্বের মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ বলে। এই তিনটি মতই বেদান্ত মত। তবে বেদান্তী বলতে শংকরের অদ্বৈত মতকেই লক্ষ্য করে। এই তিন মতই পূর্বমীমাংসাকে খণ্ডন করেছে। আরও উপমত আছে।

ভক্ত — বেদান্তদর্শন কি?

শ্রীম — উপনিষদের apparent contradictory (আপাতঃ-বিরোধী) উক্তিকে বেদব্যাস কতকগুলি সূত্রে সমন্বয় করেছেন। তারই নাম বেদান্তদর্শন। উপরোক্ত তিনজন প্রধান আচার্যই এরও ভাষ্য করেছেন। আরও কেহ কেহ করেছেন।

ভক্ত — ষড়দর্শনকার তো সকলেই তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে এই বিরোধ কেন? এই ষড়দর্শনকে কেন দর্শন বলে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও এদেশের তত্ত্বজ্ঞানীর রচিত। এদের কেন হিন্দু দর্শন বলে না?

শ্রীম — যেহেতু মানুষে মানুষে বিরোধ। ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। যার যেটি সেটি বেছে নিয়ে চলতে থাক। ঠাকুরের মহাবাক্য, যদি কিছু ভুলও থাকে কোনও মতে — তবে ভগবানই তা' ঠিক করে দেবেন। শুধু ঝগড়া করলে কাজ হবে না। আসল কথা হলো

ভগবানদর্শন। এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ। তাঁর সব কথা, কিসে মানুষের ঈশ্বরদর্শন হয়, তার জন্য।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। বেদান্তদর্শনকে ওরা মানে না। তাই হিন্দুদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা গোঁড়া হিন্দুমতবাদী তারা মানে না। উদার মতাবলম্বীরা মানে, ওদের সাধনের প্রণালী ভিন্ন, যেমন ষড়দর্শনের ভিন্ন।

ঠাকুর বলতেন, এসব মতবাদে তিনি নাই। বৃথা ঝগড়া। এক জলেরই নানা নাম। একটা নিয়ে কাজে লেগে যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরই চালিয়ে নেবেন।

শ্রীম যেন বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এই সব কথায়। তাই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পুনরায় পূর্বানুবৃত্তি করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'কথামৃতে'র অভিনয় হয় কি করে?

জগবন্ধু — ঠাকুর সাজবে কে?

শ্রীম — কেন, ও না হলে হয় না?

জগবন্ধু — ঐ পার্টই হলো main (প্রধান)।

শ্রীম — এতো কাছে। করলে যেন sacrilege (অপরাধ) বলে মনে হয়। আচ্ছা, ও করা যাবে — অন্য সব ঠিক করুন।

রাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
শনিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৮।৪৮ পল।

দশম অধ্যায়

বেগুনওয়ালার হাতে হীরা

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীম-র শয়নকক্ষ। এখন সকাল সাতটা। শ্রীম বিছানার উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ দিকের বেঞ্চে বসা জগবন্ধু, বিনয়, গদাধর ও বুদ্ধিরাম।

শ্রীম-র হাতে কথামৃতের চতুর্থ ভাগের প্রুফ। বই ছাপা হইতেছে। ছত্রিশ ফরম্ correct (শুদ্ধ) করিতেছেন। প্রুফ দেখিতেছেন আর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — শবরীর উপাখ্যান জান না? শবরী, অহল্যা এঁদের কথা বেশ ভক্তির কথা। এ জানবে। যেখানে তর্ক ফর্ক হয় সেখানে যেতে নাই। ভক্তির কথা শুনতে হয়।

ব্যাধকন্যা শবরী ঋষিদের সেবা করতেন। আর "রাম রাম শ্রীরাম, জয় জয় রাম" — নিশিদিন এই মহামন্ত্র জপ করতেন। এদিকে উপবাস। রামের জন্য ফল জমিয়ে রেখেছিলেন। কয়েক বছর পর রাম এসে দর্শন দেন। রাম তখন বনবাসী। রাম ঐ ফল খেয়েছিলেন। ফল সব তাজা ছিল।

এক মতে আছে — রামকে বললেন — প্রভো, যার জন্য এ মানবদেহ, সেই কার্য পূর্ণ হয়েছে। তোমার দর্শনই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কৃপা করে দর্শন দিয়ে এ দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে। আর কেন শরীরধারণ? তুমি অনুমতি কর, তোমার সম্মুখে এ শরীর ত্যাগ করি। রামের আদেশে লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করলেন। শবরী চিতায় আরোহণ করলেন। লক্ষ্মণ অগ্নি সংযোগ করলেন। শবরী চিতায় বসে আছেন। প্রসন্ন আনন্দময় বদন। মুখে, 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।' প্রজ্জ্বলিত চিতা। এই সব ভারতের ইতিহাস! ব্রহ্মদর্শন শেষ কথা।

শ্রীম সুর করিয়া রামনাম গাহিতেছেন।

গান। 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।'

পাঁচ মিনিট ধরিয়া গান গাহিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নিশীথ রাতে বাঘের ভয়ে ভীত লোক যদি ঐ নাম শোনে, বনের ভিতর কুটীর থেকে আসছে, তখন কেমন হয়?

সংসারের কিছু চায় না। কি অবস্থা! Death-এর (মৃত্যুর) জন্যে একেবারে প্রস্তুত।

শ্রীম মত্ত হইয়া আবার গান গাহিতেছেন।

গান। রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।

এবার ভক্তরাও সঙ্গে গাহিতেছেন ঐ রামনাম। পনের মিনিট চলিল গান। পুনরায় কথা।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — অযোধ্যায় যাও নি তুমি?

বুদ্ধিরাম — আজ্ঞে, না।

শ্রীম — আমরা গিছলাম। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন দেখলাম। শ্রীম সুর করিয়া গান গাহিতেছেন।

গান। রাম লছমন।
ভরত শত্রুঘন।।

বেশ কিছুক্ষণ গান চলিল। শ্রীম-র ভিতর একটা ঈশ্বরীয় ভাবের খেলা চলিতেছে। তাই বাহ্যত মনে হইতেছে, যেন অসংবদ্ধ আচরণ। ভক্তদের খুব মিষ্ট লাগিতেছে। ভক্তরা বাহ্য সব ভুলিয়া গিয়াছেন, যেন হিপ্‌নটিক টানে। শ্রীম-র মুখের দিকে সকলে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। চোখে মুখে জ্যোতির উজ্জ্বল ছটা।

গানের পর শ্রীম কিছুকাল নীরব। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — (অযোধ্যায়) সাধু দর্শন হল, নারকেল দিয়ে পুজো করা হল। আবার রঘুনাথদাসের আশ্রম দেখা হলো, পরমহংস একজন (রঘুনাথদাস) দেখা হল। অনেকগুলি সাধু। তার মধ্যে উনি বসে। যেন বালকের ভাব। খুব হাসিখুশি।

হাসতে হাসতে ঐ সাধু বলেছিলেন, কি করবে আর। তাঁর নাম, তাঁর

ধাম, তাঁর রূপ চিন্তা কর। তখন সবেমাত্র ঠাকুরের শরীর গেছে — কয়েক মাস।

২

শ্রীম-র হাতে কথামৃতের চতুর্থ ভাগের ২৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৯৫ পৃষ্ঠার প্রুফ। উহা হইতে পড়িয়া শুনাইতেছেন। আর ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) — মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী বেদান্তচর্চা করেন। ঠাকুরের কাছেও আসেন। ওঁর মত, সাধন করলে কর্মফলে সকলেই ঠাকুরের মতো হতে পারে। কখনও বলেন, ঠাকুরের অবস্থা পূর্বে আরও উঁচু ছিল। এখন নেমে গেছে ভক্তদের নিয়ে অত বিলাস করায়। ঠাকুর প্রমোদ করে আবার জিজ্ঞাসা করেন, কি গো তুমি নাকি বল, আমি অনেক নেমে গেছি (হাস্য)। ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, নরেন্দ্র কেমন। মহিমাচরণ বললেন, এখন তার যে অবস্থা বার বছর আগে আমার ছিলো এই অবস্থা (ভক্তদের উচ্চহাস্য)।

ঠাকুরকেই মানে না অবতার বলে। মনে করে একজন সাধু বা ভক্ত। তা নরেন্দ্রের দাম দেয় কি করে?

একজন ভক্ত — মহিমাচরণ কি দেখে বলছেন, ঠাকুর অনেক নেমে গেছেন?

শ্রীম — ভক্তি-ভক্ত নিয়ে আছেন দেখে। পূর্বে সদা ভাবমুখে থাকতেন। মন অখণ্ডেই প্রায় লীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঠেলেঠুলে জগতের contact-এ (সংযোগ স্থলে) রেখে দিতেন। মনে কর, দু'টি সারকেল পিঠেপিঠে লাগান আছে। একটি ব্রহ্ম, অপরটি জগৎ। এ দুটোর মিলন-ভূমিতে মা ঠাকুরকে রেখে দিছলেন।

সেখান থেকে ঠাকুর যেন উঁকি মেরে জগতের অবস্থা দর্শন করতেন এক একবার। তাঁর মনের gravitation (আকর্ষণ) অখণ্ডে — ব্রহ্মে। সেই অবস্থায় মা তাঁকে ভক্তদের দেখিয়ে দিতেন কে কোথা থেকে আসবে। নরেন্দ্রকে দেখেছিলেন — টক্‌টকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতি, তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র — সমাধিস্থ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) — ঠাকুরকে মা দেখালেন, এই। মহিমাচরণ বললেন, নরেন্দ্রের অবস্থা তাঁর চাইতে অনেক নীচু (সকলের

হাস্য)।

ঠাকুর বলেছিলেন, একদিন দেখলুম, এঁর (ঠাকুরের) ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বের হয়ে বলছেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই। মহিমাচরণ বলেন, সাধন করলে সকলেই ঠাকুর হতে পারেন।

শ্রীম — ভক্তদের, অন্তরঙ্গদের প্রায় সকলকেই বিশ বাইশ বছর আগে ভাবে দেখেছিলেন। মা দেখিয়েছিলেন।

একদিন বললেন, বকুলতলায় চৈতন্যসংকীর্তন দেখেছিলাম — সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে। বলরামকে দেখেছিলাম। আর এঁকে (শ্রীমকে) দেখেছিলাম।

ঠাকুর বলেছিলেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হল। তার ভিতর মাঝে বেড়া। দুই থাক লোক। একদিকে কেদার, চুনী আরও সব সাকারবাদী ভক্ত। আর একধারে নরেন্দ্র জ্যোতির স্তূপে বসা — সমাধিস্থ।

বলেছিলেন, একদিন কেশব সেন ও তাঁর দল দেখলাম সমাধি অবস্থায়। কেশব সেন ময়ূর। তার পাখা পেখমধরা। মানে দলবল সঙ্গে। কেশবের মাথায় লাল মণি। কেশব বলছে শিষ্যদের, উনি (ঠাকুর) যা বলছেন তোমরা শোন। মাকে বললাম — মা, এসব তো ইংরেজী মতের লোক। এখানে কেন আনলে? মা বললেন, কলিতে এসব হবে। তখন এখান (ঠাকুরের কাছ) থেকে 'হরিনাম আর মায়ের নাম' ওরা নিয়ে গেল। ঠাকুর বলেছিলেন, তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলেন। কিন্তু আদি সমাজে মা গেলেন না। নববিধানে আগে মায়ের নাম ছিল না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আরও কত দর্শন হয়েছে ঠাকুরের, কখনও এই চোখে কখনও সমাধিতে। এখন কেবল সমাধিতে দর্শন হয়। অন্তরঙ্গগণ সব এসেছেন। তাঁদের সব শিক্ষা দিতে হচ্ছে। সর্বদাই তাঁদের কথা ঠাকুর ভাবছেন। সবই তো প্রায় ছোকরা। তাদের সঙ্গে দিন কাটান, আনন্দ করেন। যারা ঘরে আছে, বলেন — এদের ভক্তি অশুদ্ধ — কামিনীকাঞ্চনের সেবা করেছে। রসুনের বাটি। ছেলেরা শুদ্ধ আধার। তাই এদের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত। অবতারলীলার সহায় তারা সব।

এইসব দেখে মহিমাচরণ বলতেন ঐ কথা — আগে ঠাকুরের অবস্থা

উঁচু ছিল। এখন নেমে গেছে।

মহিমাচরণের বিচার 'রাঁড়ীপুতি'-বুদ্ধির ফল। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। কি করে বুঝবে সচ্চিদানন্দের অবতারলীলা?

৩

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — উঃ, কি সব দর্শন! সব মিলে যাচ্ছে। সমাধিতে দেখেছিলেন কেশব সেন শিষ্যদের বলছেন, তোমরা এঁর (ঠাকুরের) কথা শোন। কি আশ্চর্য! কত বৎসর পরে এইটিন্-সেভেন্‌টিফাইভে ঐ দৃশ্য বাস্তব জগতে অভিনীত হয়। হৃদয়কে নিয়ে ঠাকুর জয়গোপাল সেনের বাগানে যান। কেশব সশিষ্য তখন ওখানে তপস্যা করছেন নির্জন স্থানে, বেলঘরেতে। ঠাকুর কেশবকে দেখেই বললেন, 'এঁর লেজ খসেছে'। এখন ড্যাঙ্গায়ও থাকতে পারে, জলেও থাকতে পারে। ভক্তরা শুনে হেসে উঠলেন। কেশববাবু বললেন — হেসো না, শোন কি বলছেন। এর মানে আছে। ঠাকুর বললেন, 'ব্যাঙের পোনা জলে থাকে। লম্বা লেজ। কিছুদিন পর ঐ লেজ খসে যায়। তখন ব্যাঙ হয়। সে তখন জলেও থাকতে পারে, ড্যাঙ্গায়ও থাকতে পারে।' তেমনি যার ঈশ্বরে ভক্তি পাকা হয়েছে সে ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে পারে, বনেও থাকতে পারে। সংসার তার অনিষ্ট করতে পারে না। সে বুঝেছে আগে ঈশ্বর, পরে সব।

ম্যাক্সমূলার কেশববাবুর কার্যকলাপ খুব নিবিষ্টভাবে watch (নিরীক্ষণ) করতেন। হঠাৎ মায়ের নাম কোথা থেকে ঢুকালে তাই ভাবতেন। স্বামীজীর মুখে ঠাকুরের জীবনী শুনে আর কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জেনে বুঝেছিলেন ঐ দল মায়ের নাম ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়েছে।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আর একদিন মা দেখিয়েছিলেন ঠাকুরের ঘরে নানা দেশের লোক, নানা রং-এর নানা পোষাক। নানা ভাষায় কথা বলছে। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কেন এখানে এনেছো? মা বললেন, কলিতে এরূপ হবে।

তখন কি কেউ একথা ভাবতে পারতো — এখন যা হচ্ছে বাস্তবে ঠাকুরের নামে? ওয়েস্টের বিশিষ্ট লোকেরা ঠাকুরের ভাব নিচ্ছে। আমেরিকার আশ্রমগুলিতে সব ঐ দেশের ভক্ত।

তা ছাড়া তাঁর নিজের অন্তরঙ্গরাও সকলে 'ইংলিশ ম্যান'। ওয়েস্টে ম্যাক্সমুলার প্রথমে ঠাকুরের জীবনী লিখলেন*। আরও কতজনে লিখবেন হয়তো পরে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নরেন্দ্র পূর্বে ঠাকুরের দর্শনের কথা শুনে বলেছিল, এ সব hallucination (মনের ভ্রম)। নরেন্দ্রের কথার উপর খুব বিশ্বাস। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা নরেন্দ্র বলছে, এসব দর্শন মনের বাতিক'। ঠিক যেমন শিশু মাকে বলে থাকে। মা বললেন, 'তা কেমন করে মিথ্যা হয়। তুমি যা দেখছো তা যে মিলে যাচ্ছে বাস্তবে'। তখন শান্ত হন। নরেন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজে আসা-যাওয়া করতো।

(সহাস্যে) নরেন্দ্রকে ঠাকুর শেষের দিকে জিজ্ঞাসা করলেন একদিন, তুই যে তখন আমার দর্শনকে মনের বাতিক বলতিস্, এখন তো বলছিস, সব সত্য। নরেন্দ্র সঙ্কুচিতভাবে বললো, সব দেখে শুনে এখন সব ঠিক মনে হচ্ছে। মানে, নরেন্দ্রেরও দর্শনাদি হচ্ছে।

শ্রীম দীর্ঘকাল নীরব! কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর সবেমাত্র চলে গেছেন, কয়েক মাস হলো। ভক্তরা শোকে মুহ্যমান। আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেছে। সকলেই এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে শান্তির জন্য। আমার কাছে তখন বারশ' পেপার ইউনিভারসিটির। অনেক কষ্টে মাত্র তিনশ' দেখেছি। ন'শ বাকী! আর পারা যাচ্ছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। তখন একটা risky step (বিপজ্জনক পথ) নিয়েছিলাম। ঐ বারশ' কাগজ বেঁধে রেজিস্টারের নামে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দি' বেয়ারারের হাতে। ওরা সব জানতো আমার

---

* ফ্রান্সের মনীষী রোঁমা রোঁলা — শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

ইংলিশম্যান, এখন আমেরিকাবাসী, কৃষ্টোফার ইসারউডও লিখিয়াছেন, ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদের জীবনচরিত।

অবস্থা। জানতো, ঠাকুর সবেমাত্র চলে গেছেন। তাই আর কিছু বলে নাই। নইলে এতে হাতে কড়াও পরাতে পারতো। ঐ কাগজ পাঠিয়ে দে ছুট — একেবারে অযোধ্যায়। রঘুনাথ বাবাজীর পরমহংস অবস্থা। ঠাকুরের অন্তর্ধানের কথা পূর্বেই শুনেছিলেন। তাই অতি আদরে আমাকে কাছে রেখে দিলেন। স্বামীজীরাও গিছলেন তাঁর কাছে। খুব সহানুভূতির সহিত আমাকে বলেছিলেন, ঐ কথা — তাঁর নাম, তাঁর ধাম, তাঁর রূপ চিন্তা কর — হাসতে হাসতে বলেছিলেন। পরমহংস অবস্থা। অনেকগুলি সাধুপরিবৃত হয়ে বসে ছিলেন। এখনও দেখছি, সেই সহাস্য বদন।

সেবারেই কাশীতে দর্শন হয় ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী আর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী। ত্রৈলঙ্গস্বামী জিলিপির চ্যাঙ্গারিটা হাত থেকে নিয়ে বালকের মত মৃদুহাস্যে পেছনে লুকিয়ে রাখলেন। দিগম্বর, মেঝেতে বসা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
রবিবার কৃষ্ণা তৃতীয়া ২৯ দণ্ড। ৫৫ পল।

একাদশ অধ্যায়

ভিক্ষা ও ব্রহ্মচারী

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীম-র শয়নকক্ষ। শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। এখন সকাল সাতটা।

শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। মাথায় গরম কম্ফোর্টার জড়ান। গায়ে উঁচুগলা সাদা সোয়েটারের উপর ওয়ার-ফ্লানেলের ছাই রংএর পাঞ্জাবী।

বিছানার দক্ষিণ দিকে শ্রীম-র বাম হাতে বেঞ্চে বসা জগবন্ধু, বিনয় গদাধর ও বুদ্ধিরাম।

শ্রীম গদাধর ও বুদ্ধিরামের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — সাধুদের মধ্যে যাঁদের দেখবে শুষ্ক, গম্ভীর, কথা কন না, তাঁদের বুঝবে সবে হাঁড়ি চেপেছে। আর যাঁদের দেখবে আমোদ আহ্লাদ করছেন, খুব হাসিখুশি, তাঁদের বুঝবে আনন্দ লাভ হয়েছে। আর ওঁদের এখনও কত টগ্‌বগ্‌, ঝিমঝিম, কত হবে। তবে লাভ হবে আনন্দ।

এই আনন্দলাভের জন্যই অত সব আয়োজন। ত্যাগ, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, সাধুসঙ্গ, মাধুকরী, ভিক্ষা প্রভৃতি কত কি। তাই সাধুরা আশীর্বাদ করেন — আনন্দলাভ হোক।

শ্রীম এইবার বুদ্ধিরাম ও গদাধরের সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। আবার কখনও গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছেন। ইহারা দুইজনেই আজকাল তপস্যার ভাবে থাকে। উদর পূরণের জন্য চাল ভিক্ষা করিয়া আনে। নিজেরা রন্ধন করিয়া খায়। প্রথমে জীবনধারণের অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। একজন বন্ধু লুকাইয়া খাওয়াইত। উহা শ্রীম-র অভিপ্রেত

নয়। প্রথমে চাল ভিক্ষা করিয়া রাঁধিতে তাহারা রাজী হয় নাই। শ্রীম অনেক বুঝাইয়া রাজী করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার অধিকার আছে। তাছাড়া কত স্বাধীন। আবার স্বপাক অতি শুদ্ধ। ঠাকুরের কথায় আমি অনেক কাল স্বপাক খেয়েছি। শ্রীম ভিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীদের প্রতি) — ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করে খেলে ভগবান তুষ্ট হন। যে ভিক্ষা করতে শিখেছে সে জগৎ জয় করেছে। ওইটুকু চাল ফুটিয়ে খেয়ে বাকী সময় 'রাম রাম' করা। অত অল্পে শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়। তা হলে কেন অপরের গলগ্রহ হওয়া? সমাজ ভিক্ষা দেয় নিশ্চিন্তে তাঁর নাম করতে পারবে বলে।

কি করিয়া ভিক্ষা করিবে তাহাও বলিয়া দিতেছেন।

শ্রীম — রাস্তায় ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে যাবে। কোন বাড়িতে ঢুকবার সময় মনে করবে, আমি ভগবানের নাম নিশ্চিন্তে করতে পারবো বলে ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি। 'নারায়ণ হরি' এই আহ্বানের অর্থও তাই। হে নারায়ণ, হে সর্বদুঃখ-হরণকারী, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তোমার দ্বারে উপস্থিত।

বেশী চাল দিলে নিবে না। একমুষ্টি মাত্র নিবে। পয়সা দিতে গেলে একটি পয়সা নিতে পার। এক বাড়িতে সব চাল ডাল দিলে নিবে না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করবে — ঐ এক মুষ্টি করে। তোমার প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল হয়ে গেলেই চলে আসবে। একদিন ভিক্ষা করে জমিয়ে রেখে অন্য দিন খেতে নাই। ঠাকুর বলতেন, সঞ্চয় করে না পক্ষী আর দরবেশ।

শ্রীম (সহাস্যে ব্রহ্মচারীদের প্রতি) — মাঝে মাঝে গলাধাক্কা, কানমলা প্রসাদও পেতে পার। বকে দিতে পারে, — বেটা জোয়ান ছোক্‌রা, কাজ ক'রে গিয়ে খা। এ সবেতে মন স্থির রাখবে। মনে করবে, ভগবান আমার চিত্তসাম্যের জন্য এসব অপ্রীতিকর ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছেন। এসব আমার কল্যাণের জন্য। মান ও অপমানে চিত্ত সমান থাকবে। এসব ব্রহ্মদর্শনের সাধন।

ভিক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি — প্রথম, উদরপূরণ; দ্বিতীয়, মান ও অপমানে চিত্তের সমতা অভ্যাস। একজন তিরস্কার করলো, অপমান করলো, তাতেও

যে ভাব, আর একজন সম্মান দেখালো তাতেও সেই ভাব রক্ষা করা। উভয় অবস্থাতেই মনে করা — ভগবানই এই সব দিচ্ছেন আমার চিত্তশুদ্ধির জন্য। মানে (সম্মানে) খুশি, অপমানে দুঃখী হলে হবে না। সুখ দুঃখ দুই-ই সমান বোধ হয় ভগবানদর্শনে। তাই সাধকের অবস্থায় এইসব ভগবানদর্শনের সাধন।

গদাধর — বাবা, অততে কাজ কি? অত পারা যায় না। ফের রান্না করা অত হ্যাঙ্গাম।

শ্রীম — আচ্ছা, রান্না আমি করে দেব। তুমি চাল এনে দাও ভিক্ষা করে।

একটি ভক্ত (স্বগত) — আহা, কি ভালবাসা — যেন মা! সন্তান অনিচ্ছুক হলে মা তার কাজ আপনিই করে দেয়। একেই বুঝি অহেতুক কৃপা বলে। সামান্য লোক এই দুই ব্রহ্মচারী। বিদ্যাবুদ্ধিতে ডিগ্রি নাই। কোন ছাপ নাই। কিন্তু তাদের অন্তর দেখতে পেয়েছেন। তারা ঠাকুরের শরণাগত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবে। তাই মায়ের হৃদয় নিয়ে তাদেরকে সর্বত্যাগের পথে দাঁড়াতে সহায়তা করছেন। ঠাকুরের সময় থেকে আজ চার পুরুষ ধরে শুদ্ধচিত্ত কুমার যুবকদের এইরূপ ত্যাগব্রতে ব্রতী হতে সহায়তা করে আসছেন। নিষ্কাম ভালবাসা বুঝি মূর্তিমান, অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনে!

অগত্যা ব্রহ্মচারীদ্বয় ভিক্ষায় বাহির হইল। চারতলার ছাদে রান্না করে। শ্রীম কাছে আসিয়া উৎসাহ দেন। রান্নার সব সরঞ্জাম তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অপর ভক্তদের কাছে কত সুখ্যাতি করেন, ইহাদের ভিক্ষা ও স্বপাকের জন্য। আজও কত প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

২

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — আহা, তোমরা কি মহৎ কাজই করছো! চাল ভিক্ষা করা, আবার রান্না! এ কি কম কাজ? ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাব না এলে ভিক্ষা করা যায় না। এ তো ভিখারীর ভিক্ষা নয়। এ যে ভগবদ্ভক্তের দেহ ধারণের জন্য পবিত্র ভিক্ষা। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। আমি তাঁর চিন্তা করতে পারবো নিশ্চিন্ত হয়ে, তাই এই ভিক্ষা। ভক্তগণের জন্য

যা করা হয় তা-ই শুদ্ধ, পবিত্র, মনের উন্নতিকারক।

দেখ না, এই কয়দিনেই ভিক্ষা ও রান্না করে খেয়ে কত শিখেছো। কত কথা মনে করতে পারছো — ঠাকুরের মহাবাক্য। রাঁধতে রাঁধতে হয়তো মনে উঠবে — 'জ্বাল টেনে নাও, আলু পটলের লাফানি সব বন্ধ।' 'মাছের তেলে মাছ ভাজা।' 'মা মাছ দিয়ে ছেলেদের নানারকম রেঁধে দেয় — যার যা পেটে সয়।' 'নাচ কোঁদ বউমা, হাতের আটকেল আছে।' 'মা রাঁধছে আর ওদিকে ছেলেকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে'। — এসব কত কথা মনে উঠবে। 'যার যা পেটে সয়' — আহা, এ কথাটি মনে রেখে রাঁধবে।

শ্রীম নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আচ্ছা, যে যা জানে সে তা করে না কেন? (গদাধরকে দেখাইয়া) এ পালায় রান্নার কথা শুনলে। কেমন করে বোঝে?

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — এই যে তুমি পুরীতে যাবে — এটি বেশ। বেশ তো হেঁটে হেঁটে যাও না। কতদিন আর লাগবে — দু'তিন মাস?

রঘুনাথ দাস রাজপুত্র, গৃহত্যাগ করে পুরী গিছলেন বার দিনে। তিনদিন তিনবেলা একটু মুখে দিছলেন — একদিন দুধ, একদিন মূলো। এই রকম। বড় ঘরের একমাত্র ছেলে। বয়স মাত্র উনিশ। সুকুমার তনু।

আবার নবদ্বীপ থেকে ভক্তরা যেতেন পুরীতে প্রতি বৎসর চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে। শিবানন্দ সেন ছিলেন লীডার। হেঁটে যেতে এক মাস লাগতো। আসতে আর এক মাস। চার মাস থাকতেন পুরীতে।

হেঁটে যেতে যে কষ্ট তার চেয়ে শতগুণ বেশী আনন্দ। তাইতো সাধুরা পরিব্রাজক হন। নিঃসম্বল। এক ভগবান সম্বল। কত বিপদের সম্মুখীন হয়, কত মান সম্মান মিলে। এই দুই অবস্থাতেই মনে সাম্য রাখতে চেষ্টা করে। এই সাম্য থাকে 'সম'কে মনে রাখলে, 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' (গীতা ৫:১৯)। তাই পর্যটন সাধুদের অবশ্য করণীয়।

আর জীবিকার্জনের ভীতিও কেটে যায়। এতে মনকে যোগভ্রষ্ট করে দেয়। তাই ভিক্ষা ও পর্যটনের ব্যবস্থা ভারতে।

আবার শীতোষ্ণ, অনাহার ও অতি আহার, সুখদুঃখ বোধ, লাভালাভ এসবে মনকে স্থির — balanced রাখবার চেষ্টা করে। কত শিক্ষা!

(বুদ্ধিরামের প্রতি) যাও না হেঁটে হেঁটে। মনে খুব শক্তি আসবে। বিশ্বাস বাড়বে।

শ্রীম নীরব। আবার কথা কহিতেছেন — চোখে দুষ্ট হাসি বালকের ন্যায়।

শ্রীম (সহাস্যে বুদ্ধিরামের প্রতি) — শিষ্যি করবে। অনেক শিষ্যি জুটবে। তারা পা টিপবে (হাস্য)।

(গদাধরকে দেখাইয়া) এর হয়েছিল। টাকা পয়সা পড়তো যেই গাছতলায় বসে ধ্যান করতো — দক্ষিণেশ্বরে। লোকে টাকা দিতো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কত রকম আছে। কেউ টাকার জন্য কেউ স্বর্গ-ফর্গের জন্য, কেউ এখানকার মান সম্ভ্রমের জন্য — এই সবের জন্য তাঁকে ডাকে।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — মিশনারিরা বেশ বলে, নূতন লোক সাধু হতে এলে — 'তুমি কি করিতেছিলে? যাহাই করিতেছিলে তাহাই করিতে থাক।'

গীতার ভাবও তো তাই! 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ' (গীতা ১৮:৪৮)।

যে যা জানে তাই যদি নিষ্কাম হয়ে করে, ভগবানের নামে করে, কোনও benefit (লাভ) না নেয় এ থেকে, তবে তা দিয়ে ঈশ্বরদর্শন হয়।

এ (গদাধর) রান্নার কথা শুনলেই ভাগে। আশ্চর্য, কি করে বোঝে? কাজকে ভয় করলে কাজ আরও জোরে ঘাড়ে চেপে বসে। যখন যা এসে পড়ে, তাঁর সেবা করছি ভেবে করে ফেললে, কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কর্মযোগের এই রহস্য। যাতে বদ্ধ হয় তাতেই মুক্তি, যদি ঈশ্বরকে ধরে।

দেখ না, হরিপ্রসন্ন মহারাজ। কত বড় ইঞ্জিনিয়ার! পাঁচ-ছ' শ' টাকা মাইনে, ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার — কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধু হলেন। এখন এলাহাবাদে মঠ করে আছেন। কিন্তু বেলুড়মঠে বা ব্রাঞ্চে ইঁটের কাজ

হলেই তাঁকে এলাহাবাদ থেকে ডেকে আনে। বড় বড় কাজ করেছেন কিনা!

শ্রীম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মচারীদের সাদা কাপড়ে ভিক্ষার অসুবিধা হইতেছে। তাই তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিবে। ফষ্টি-নষ্টির ভিতর দিয়া শ্রীম ঐ বিষয়ে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — গেরুয়া নিবে তা হলে অনেক লোক আসবে। পায়ের ধূলো নেবে (হাস্য)। কি বল?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যে ঈশ্বরকে চায় সে অন্য কিছু চায় না। তার খাবার আপনি আসে। (বুদ্ধিরাম লক্ষ্য) তাঁকে হৃদয়ে বসাও তা হলে আর কিছু চাইতে ইচ্ছা হবে না।

তিনি (ঠাকুর) কিছুই চান নি। খালি মাকে — ঈশ্বরকে চেয়েছেন। বিছানার চাদর ছিঁড়ে গেছে দেখে, (লক্ষ্মীনারায়ণ) মারোয়াড়ী দশ হাজার টাকা দিতে চাইলো ঠাকুরের সেবার জন্য। নিলেন না।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম ভক্তদের প্রতি — আহা, কি কথাই বলেছেন — 'বরং চন্দ্রে কলঙ্ক আছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ-শশীতে কলঙ্ক নাই।' 'সন্ধ্যা'র editor (সম্পাদক) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন এই কথা। আমি পড়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিছলাম।

৩

বড় জিতেনের প্রবেশ। সঙ্গে দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাহাদের বয়স ছয় ও নয় বৎসর। আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহার বয়স দশ। তিনি হাইকোর্টের ওকালতি পাশ। হাইকোর্টে কর্ম করেন — বেঞ্চ ক্লার্ক। মেয়ে দুইটি শ্রীম-র বিছানার উত্তরে চেয়ারে বসিল। আর ছেলেটিকে লইয়া জিতেনবাবু শ্রীম-র বিছানায় বসিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — 'বরং চন্দ্রে কলঙ্ক আছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ-শশীতে কলঙ্ক নাই' — আহা, কি কথাই বলেছেন উনি, 'সন্ধ্যা'র এডিটার।

একজন ভক্ত (স্বগত) — এ যেন ড্রামা। এতক্ষণ শ্রোতারা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মচারী। তাদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা জিতেন সেনের জন্য কার্যকরী নয়। ইনি গৃহস্থাশ্রমী। কিছুদিন পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তাহার বৃহৎ পরিবার তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে। তাই এই পটপরিবর্তন নিমেষে। সকল শোকদুঃখের মহৌষধ একটি জীবন্ত ভক্তির দৃশ্যের অবতারণা করিলেন।

শ্রীম (জিতেন সেনের প্রতি) — আমরা শবরীর কথা বলছিলাম। দিবানিশি তিনি কীর্তন করছেন রামনাম — 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।'

আহা, কি দৃশ্য! মনে থেকে জগৎ আপনিই খসে পড়েছে। আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। এক রামচিন্তায় মন নিমগ্ন। যেটুকু দেহ-বুদ্ধির লেশ আছে, তাও রামনাম-কীর্তনে নিয়োজিত। আহা, কি সব দৃশ্য এ দেশে মূর্তিমান হয়েছে ও হচ্ছে!

শ্রীম মত্ত হইয়া সুরসংযোগে ঐ গান গাহিতেছেন — 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম'। কে যেন অদৃশ্যে জোর করিয়া ভক্তদের মনকে টানিয়া আনিয়া এই মহামন্ত্র-কীর্তনে নিযুক্ত করিলেন। ভক্তরাও শ্রীম-র সঙ্গে গান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য, স্থান কাল পাত্র এসব ভাবনা অন্তর্হিত হইল কিছু কালের জন্য।

বড় জিতেন ও ছেলেমেয়েদের মন হইতে শোকতাপের কালিমা ধুইয়া মুছিয়া নির্মল করিয়া আনন্দে তাহাদের মনে সকল দুঃখকষ্ট হরণকারী রামলীলার সরস ও সজীব চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।

শ্রীম (বালিকাদের প্রতি) — তোমরা জান এ গান? গাও না, আমার সঙ্গে গাও। রাম লক্ষ্মণকে তোমরা জান? বল তো আর কে আছে?

ছোট বালিকাটি উত্তর করিল, 'সীতা'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐ জাত কিনা, তাই মনে আছে। আহা ঠাকুর বলেছিলেন, মা আমায় সীতার মত করে দাও। সীতার কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। কেবল রামচিন্তা! ও-ও! একেই বলে immortality of soul (আত্মার অমৃতত্ব)। মৃত্যুকেও গ্রাহ্য নাই।

মৃত্যুভয়ে ভীত, মৃতের জন্য শোকার্ত, এই উভয়ের মহৌষধ রামনাম।

'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।'

শ্রীম কুমারীদের হাতে মনাক্কা দিলেন, আর মিছরী। বলিলেন, কুমারীপূজা আগে। এরা জগদম্বার জাত।

শ্রীম — কেউ জল দিয়ে ধুইয়ে দেয় তো বেশ হয়।

জগবন্ধু — আজ্ঞে আমি দিচ্ছি।

শ্রীম — না, আপনি যা করছেন তাই করুন। এই প্রুফ শীঘ্র দেখে ফেলুন। এই বেলাই প্রেসে পাঠাতে হবে। বইটা (কথামৃত — চতুর্থ ভাগ) অবিলম্বে বের হওয়া উচিত।

শ্রীম (কুমারীদের লক্ষ্য করিয়া) — কি বলে — 'A bird in the hand is equal to two in the bush' — নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল (হাস্য)। (মনাক্কা, মিছরী) ওদের হাতে আছে এখন।

বড় জিতেন কথাপ্রসঙ্গে বই পড়ার কথা উত্থাপন করিলেন।

শ্রীম — বইতে কি আছে? বই পড়ে কি হবে? কেউ কেউ গুচ্ছের বই পড়লেই মনে করে খুব হয়েছে। ওতে কি আছে? কিছুই নাই। তাঁকে চিন্তা করলে সব আসে।

ঠাকুর কি পড়েছিলেন? কিন্তু বহু বই পড়া লোক তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকতো দেখেছি, হাত জোড় ক'রে।

তাঁর dictum (মহাবাক্য) রয়েছে — 'পড়ার চাইতে শোনা ভাল। শোনার চাইতে দেখা ভাল।' কাটতে পারে একথা কেউ?

শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে, এর মর্মবোধ হয় কই? তপস্যা চাই। তপস্যা করলে মর্মবোধ হয়। তপস্যা নাই, শুধু বই পড়ে তো মাথা গরম করা। কি বলে, an ounce of practice is better than tonnes of book-learning — দশবার, একান্ত মনে বসে, 'রাম রাম' করলে যা হয় রামের সম্বন্ধে হাজার বই পড়ে তা হয় না।

'বাজনার বোল হাতে আনতে হয়' — এই আর একটি তাঁর মহাবাক্য।

বড় জিতেন (সবিনয়ে) — সর্বদা যে হয়ে ওঠে না (ঈশ্বরচিন্তা)!

শ্রীম — তা' কেমন করে হবে? তাইতো বলেছেন তিনি নির্জনে যেতে। তা' যাবে না। আর্ম চেয়ারে বসে হয় না।

বড় জিতেন (আর্তির স্বরে) — মহামায়ার খেলা।

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে) — হাঁ, মহামায়ার খেলা। কিন্তু পুরুষকার চাই। ও কি রকম? Adaptation! (উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করণ!) Inertia — আলস্যে পাথরের মত নিশ্চলতা, নড়তে চায় না।

তাই মীরাবাঈ বলেছিলেন, সবই স্ত্রীলোক। পুরুষ, এক কৃষ্ণ। স্ত্রীলোকদের ঐ গুণ — আলস্যে নিশ্চল।

শোনা যায়, মীরাবাঈ বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। উনি বলে পাঠালেন — স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দেখা করেন না। শুনে মীরাবাঈ বিস্ময়ে বললেন — আচ্ছা! বৃন্দাবনে আর একজন পুরুষ এসেছে দেখছি! এ কথা শুনে সনাতন গোস্বামী এসে দেখা করে ক্ষমা চাইলেন।

ভগবানের অংশে যাঁদের জন্ম তাঁদের পুরুষকার হয়, ঠাকুর বলেছিলেন। অর্জুনের ছিল।

বড় জিতেনের কনিষ্ঠ পুত্র আসিয়াছে। হাতে আঙ্গুর, বড় জিতেন আঙ্গুর হাতে লইয়া শ্রীমকে বলিতেছেন, দু' একটি দানা আপনি খান।

শ্রীম — আমি খাব কি বলেন? বলুন, ঠাকুরকে দিন। ব্যাসদেব কি বলেছিলেন? — আমি খাই নাই — ঠাকুরকে দিয়েছি।

গোপিনীরা যমুনা পার হবে। মাথায় দুধ দই মাখনের পসরা। ব্যাসদেব বললেন — ক্ষিদে পেয়েছে, খাওয়াও। পার করে দেব। তারপর ওদের দুধ দই মাখন সব সাবাড় করে দিলেন। আর বললেন — যমুনে, আমি যদি না খেয়ে থাকি তবে তুমি দু'ভাগ হও। যমুনা দু' ভাগ হলো। আর ওরা পার হয়ে গেল। এইটিই ঠিক — ঠাকুরকে খাওয়ানো।

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
রবিবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, ২৯ দণ্ড ৫৫ পল।

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তম বৈদ্য শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। অফিস ঘর। অপরাহ্ন একটা। শ্রীম অধ্যক্ষের চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। চেয়ারটি হাতাহীন, যেমন রেলের স্টেশন-মাস্টারের চেয়ার। পরনে সাদাপাড় ধুতি। গায়ে লং ক্লথের পাঞ্জাবী। স্কন্ধের উপর দিয়া ভাঁজকরা মোটা চাদর বক্ষে দোলায়মান। শীর্ষ বিরলকেশ। শুভ্র, কিঞ্চিৎ লম্বিত কেশ শ্রীম-র মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ও কর্ণোপরি শোভিত। আর আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু। উন্নত প্রশস্ত ললাটতলে উজ্জ্বল সম্মুখপ্রসারিত দুইটি বৃহৎ চক্ষু অভ্যন্তরের ব্রহ্মজ্যোতির দ্যোতক। শ্রীরামকৃষ্ণ এই নয়নদ্বয়কে, দুইটি 'শালগ্রাম' বলিতেন। আর তাহাতে সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিতেন। উন্নত দেহ শ্রীম এই চেয়ারে কখনও একটানা ছয় ঘন্টা বসিয়া থাকেন। মুখমণ্ডলে কল্পিত প্রশান্ত রাজসিকভাব। 'কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য' — শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণিত গৃহাশ্রমী ব্রহ্মজ্ঞের পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে অন্যতম এই লক্ষণটি শ্রীম-র মুখে প্রস্ফুটিত।

স্কুল ছুটি হইয়াছে। শিক্ষকগণ কেহ কেহ চলিয়া গিয়াছেন। কেহ অফিসে বসিয়া আছেন। শ্রীম একটি যুবক শিক্ষককে কিছু কাজ করিতে বলিলেন। তিনি ভক্ত। তাঁহার এখন কোন কাজ করিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহার নিজের একটা প্রোগ্রাম আছে। আর এই কাজ স্কুলের বটে, কিন্তু রুটিনের বাহিরে। তাই তিনি অসন্তুষ্ট। অনিচ্ছায় কাজ করিতেছেন। কাজ শেষ হইলে আজ তিনি ঘরে রহিলেন না। গড়ের মাঠে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাসস্থান মর্টন স্কুল।

এখন রাত্রি সওয়া আটটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে চেয়ারে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন চারতলার সিঁড়ির ঘরে। শীতকাল। বেশ আসর জমিয়াছে। আজ শ্রীম ভক্তগণকে অকাতরে হাস্যরস পরিবেশন করিতেছেন।

যুবক শিক্ষকের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই সকলের সস্নেহ সচেতন কৌতূহল-দৃষ্টি যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীম-র চক্ষুতে ও মুখমণ্ডলে বালকের আনন্দময় দুষ্ট হাসি। শিক্ষকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না — আজের হাস্যরসের মধ্যমণি উনি স্বয়ং। ভক্তগণের নয়নযুগলে সহানুভূতির আপন-করা প্রেমভাব বিকশিত।

শিক্ষকের সশ্রদ্ধ অভিমানের কাছে শ্রীম আজ মায়ের মত নত হইয়া পড়িয়াছেন। শিক্ষককে হাসাইবার জন্য শ্রীম কতই না কৌশল অবলম্বন করিতেছেন রঙ্গরসের ভিতর দিয়া।

শিক্ষক যুবক, ভক্ত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে কৃতসংকল্প। শ্রীম-র কৃপাতেই তিনি বুঝিয়াছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। ঋষিগণ নানা ছন্দে নানা মন্ত্রে বেদমুখে যাঁহার গুণগান করিয়াছেন সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্যমনের অতীত, তিনিই এবারে নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনি শ্রীম-র কৃপাশ্রয়ে রহিয়াছেন। মর্টন স্কুলের অধ্যাপনার কার্য গৌণ। উহা শ্রীম-র ইচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম মিলনের পর হইতেই স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়াছিলেন সর্ব বিষয়ে। শ্রীম, জীবিকার্জনের জন্য অধ্যাপনাকর্ম বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পর তিনি ঐ কর্ম কেবল অনুমোদনই করেন নাই, অধিকন্তু ঐ কর্মে উৎসাহ প্রদান করিতেন। "ঠাকুর বলতেন", শ্রীম-র মুখের কথা, "অধ্যাপনা ঋষিদের কর্ম। অতি শুদ্ধ কর্ম। ছল চাতুরী নাই। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অনুকূল। ব্রহ্মবিদ্যার পরই স্থান লৌকিক বিদ্যার। বিদ্যার অনুশীলনে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও মার্জিত হয়। এই বুদ্ধি ব্রহ্মবোধের সহায়ক। আর এক কথা, শাস্ত্রকথিত চার প্রকার দানের মধ্যে — অন্নদান, জীবনদান, বিদ্যাদান ও ব্রহ্মবিদ্যা-দান — বিদ্যাদানের স্থান তৃতীয়। এর পরই জ্ঞানভক্তিদান। নিষ্কামভাবে করলে এই বিদ্যাদানই ব্রহ্মজ্ঞান দিবে।"

ঠাকুর শ্রীমকে আদেশ করিয়াছিলেন, বাড়ির কাজ করে দেবে। কিন্তু থাকবে বাইরে, একটু দূরে। আর স্বপাক হবিষ্যি খাবে। আপন হাতে সব আপন কাজ করবে। পরিবারের সেবা নিবে না, কিন্তু তাদের সেবা করবে।

শ্রীম বলেন, ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, যে দেহ ধারণের জন্য অপরের কাছে বদ্ধ, সে অবিদ্যার বন্ধন থেকে কি করে হবে মুক্ত? আরও বলেছিলেন, যে মন নানান খানা ভোগে বদ্ধ, সে মন ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে কি করে হবে মুক্ত?

শ্রীম অন্তেবাসীদের বলেন, প্রথম — মুক্তি চাই পাঁচজনের হাত থেকে, জীবনধারণের জন্য বন্ধনমুক্তি। দ্বিতীয় — মুক্তি ভোগবিলাস থেকে। তাই স্বোপার্জন, সরল জীবন ও স্বাবলম্বন দরকার।

শ্রীম তাই এই শিক্ষক ভক্তকে অধ্যাপনা স্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে ঐ তিন বিষয়ের — স্বোপার্জন, সরল জীবন ও স্বাবলম্বন — সাধন হইবে। তখন নিশ্চিন্ত মনে ভগবদ্‌চিন্তা হইবে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইবে।

শ্রীমকে ঠাকুর আর একটি বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইটি কর্ম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'শরীরধারণ মানেই কর্ম। শরীরই কর্ম। কর্মের বন্ধন অবশ্যম্ভাবী, তাই যে কাজ সামনে এসে পড়ে তাই করবে। কিন্তু এর ফলভোগ নিজে নেবে না। যতটুকু নইলে নয়, ততটুকু নেবে। যেমন বড় ঘরের দাসী নেয়। ভাল মন্দ সব কাজ তাঁর। এইভাবে যে কর্ম করে, কর্মবন্ধন তাকে ছেড়ে দেয়। যে নিজের কাজ, পরিবারের কাজ, অফিসের কাজ, সব কাজ, ঈশ্বরের মনে করে নিষ্কামভাবে সব করে, কর্মফল তাকে বাঁধতে পারে না। তার জীবিকার জন্য ঈশ্বর মাসোহারা করে দেন। যে ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন করে এক মনে, মালিক তাকে পেনসান্ দিয়ে দেয়। যে সর্ব কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে, ভগবান তার হাতের মুঠোয়। শরীর মন আত্মা মনে মনে তাঁকে সমর্পণ ক'রে সারা জীবনভর ওটা হাতে আনা চেষ্টা করে'।

শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য মহাপুরুষের সঙ্গ ও সেবা। শিক্ষকতা গৌণ। কিন্তু, শিক্ষকতার প্রধান লাভ শ্রীমকে নানা অবস্থায় watch (পর্যবেক্ষণ) করা। শিক্ষক এখনও কার্যের ভিতর ভেদ দেখেন। সকল কাজ ভগবানের কাজ, উহা সর্বদা শুনিলেও কাজে পাকা হইতে দেরী আছে। শিক্ষক অক্লান্তভাবে শ্রীম-র যাবতীয় কাজ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। শ্রীম তাঁহার সেবার তৎপরতা দেখিয়া ভক্তদের কাছে সর্বদাই সুখ্যাতি

করেন। কখনও বলেন অপর ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে, ইনি সাত্ত্বিক কর্মের উদাহরণ। বলেন, দেখুন কি রকম তৎপর। সদা প্রস্তুত। আবার কাজের সময় ইনি, 'মুক্তসঙ্গ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত'। শ্রীম লক্ষ্য করিতেছেন, শিক্ষক সারাদিন শ্রীম-র কাজ করিতেছেন। কিন্তু স্কুলের কাজকে শ্রীম-র কাজ বা ঠাকুরের কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। তাহার জন্য মনে চঞ্চলতা ও অশান্তি। ইহা দূর করিবার জন্য ঠাকুরের 'উত্তম বৈদ্য' সাজিয়া বুকে হাঁটু গাড়িয়া শিক্ষককে জোর করিয়া রুটিনের বাহিরের কাজ করিতে শ্রীম আদেশ দিলেন।

শিক্ষক নিত্য শ্রীম-র কিঞ্চিৎ শরীরের সেবা, শ্রীম-র আদেশে নানা স্থানে ও নানা জনের কাছে শ্রীম-র হইয়া যাওয়া, নানা ধর্মস্থানের বক্তৃতার রিপোর্ট শ্রীমকে পরিবেশন করা, কথামৃত ছাপান, প্রুফ দেখা, আবার কখনও বিদেশাগত ব্যক্তিদের নিকট শ্রীম-র আদেশে যাওয়া ও ধর্মবিষয়ের আলোচনা করা, সাধ্যমত ভক্তদের নিত্য সেবা করা — এই সব কাজ করিতেছেন অক্লান্তভাবে। আবার, শ্রীম-র কথামৃত সারাদিন শোনা ও রাত্রিতে লেখা। কখনও এমন হইত, সব কথা রাত্রি জাগরণ করিয়াও লেখা সম্ভব হয় নাই। শয়নের সময় এগারটা হইতে তিনটা। তিনটায় উঠিয়া ধ্যান করিতে হয়, ছয়টা পর্যন্ত। ধ্যান-ভজনহীন বেতালা ভক্তদের ঠাকুরের ন্যায় শ্রীম কাছে রাখিতে পারেন না। তদুপরি স্বপাক আহার। আর স্কুলের কাজ। এমন সময় গিয়াছে শিক্ষক কয়েক বৎসর রাত্রিতে নিদ্রার সময় পাইতেন না। শ্রীম-র কথার ডায়েরী লিখিতে লিখিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া যাইত। তিনটার পর নিদ্রা নিষেধ। এটা ধ্যানের সময়। শ্রীম-র ধর্মসভার আসর নিত্য বসিত অপরাহ্ন চারিটায়, আর বন্ধ হইত রাত্রি দশটায়। আহারাদি কার্য সারিতে বাজিয়া যায় এগারটা।

২

অত কর্মতৎপর হইলেও শিক্ষক স্কুলের কাজকে শ্রীম-র কাজ বলিয়া সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেন গ্রহণ করিতে পারেন নাই? মনের ভাব বিশ্লেষণ করিলে একটিমাত্র কারণই ধরা পড়ে — অপর শিক্ষকগণের সঙ্গ। তাহাদের নানা অভিযোগ সর্বদাই লাগিয়া থাকে। এইসব কথা

শিক্ষকের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীম-র ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি উহা দেখিতে পাইয়াছে। ধর্মান্বেষীর পক্ষে শিক্ষকসঙ্গও কুসঙ্গ। তাহাদের অভিযোগ ন্যায্য হইলেও ধর্মান্বেষী ভক্ত শিক্ষকের পক্ষে উহা অতিশয় হানিকারক। যে কোন অসন্তোষের ভাব মনে থাকিলে উহা ভক্তদের মনকে ইষ্টপদে লগ্ন করিতে দেয় না। ইষ্টে অবিচলিত মনঃসংযোগের জন্যই ভক্ত সব ছাড়িয়া শ্রীম-র আশ্রয় লইয়াছেন। শ্রীম আজ পরম কারুণিক গুরুরূপে 'উত্তম বৈদ্য' সাজিয়া এই অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প। বাহিরে কঠোরতা, কিন্তু ভিতরে সহস্র মায়ের নির্মোহ স্নেহ। শ্রীম আজ এই সঙ্গে অসন্তোষের মূল কারণটি সমূলে উৎপাটিত করিবেন। এই মূল কারণটি শিক্ষকের স্বাভাবিক অবিদ্যাপ্রসূত কর্মভেদ জ্ঞান।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অতি বিশিষ্ট অন্যতম পার্ষদ সমপ্রদর্শী আচার্য শ্রীম সচেতনভাবে অভিমানে স্ফীত ভক্ত শিক্ষকের মনে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। অফিসে অপর শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকিলেও ভক্ত শিক্ষককেই রুটিন বহির্ভূত কর্ম করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কর্মভেদ আজ দূর করিবেন।

শিক্ষক অনিচ্ছায় চুপ করিয়া কর্ম করিয়া দিয়া সুপ্ত ক্রোধ ও অভিমানে গড়ের মাঠে পলায়ন করিলেন। চার ঘন্টার একান্তবাসের ফলে শিক্ষক তাঁহার অবগুণ দেখিতে পাইলেন। মনে মনে বিচার করিলেন, আমি তো শ্রীম-র কাছে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য আছি। আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তাহা হইলে শ্রীম-র আদেশ আমার অম্লান বদনে পালন করা উচিত। আমার নিকট স্কুলের কাজ আর শ্রীম-র শরীরের সেবার কাজ এক হওয়া উচিত। শ্রীম-র সেবাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার কৃপায় ঠাকুরে অবিচলিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিব, এই আশাতেই আমি তাঁহার কাছে রহিয়াছি। কর্মভেদ দ্বারা আমি আজ আপনার মনকে অন্যায় অভিমানে স্ফীত করিয়াছি। তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হইবে। এই সংকল্প লইয়া পুনরায় শিক্ষক ফিরিয়া আসিলেন শ্রীম-র পদপ্রান্তে। শিক্ষক ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু অভিমানের লেশ রহিয়া গেল। তাই তিনি কাষ্ঠমৌন অবলম্বন করিলেন। কথাও কহিবেন না, হাসিবেনও না।

শ্রীম মায়ের মত নিচে নামিয়া কত কথা, কত রঙ্গরস করিতেছেন ভক্তসঙ্গে, শিক্ষকের মুখে হাসি আনিবার জন্য। শিক্ষকের মুখ অভিমান-মেঘাবৃত। শ্রীম হার মানিয়া ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি জনান্তিকে) — মানুষ কাজ করলে বুঝি হাসে না? বাবুরা মনে করে কাজ না করলেই ভাল। কিন্তু, জানে না অনেক কাজ করলে শীঘ্র বৈরাগ্য হয়। সব কাজ ঠাকুরের, এই জ্ঞান হলেই বৈরাগ্য। মানে, সংসারে বিরাগ, ঈশ্বরে অনুরাগ।

লণ্ঠনের আলোতে শ্রীম দেখিয়াছেন শিক্ষক ফিরিয়া আসিয়াছেন। তথাপি অজ্ঞতার ভান করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, দুষ্ট হাস্যে) — জগবন্ধুবাবু আসেন নাই?

একজন ভক্ত — এসেছেন।

শ্রীম কিছু দীর্ঘকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি রঙ্গরসচ্ছলে) — একটা বেশ গল্প আছে। একটা গরু আর, একটা ঘোড়া ছিল একজনের। গরুটাকে সারাদিন হালে জোতে। তার কষ্টের কথা বন্ধু ঘোড়াকে সে বললে। ঘোড়া বলে দিল, কাল যখন জুতবে তখন খুব পা ছুঁড়বে। সে তাই করলো। চাষী তখন গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াটাকে জুতে দিল। (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — এখানেই শেষ হয় নি — next chapter (পরের অধ্যায়) আছে। হাল টানতে ঘোড়ার বড় কষ্ট হচ্ছে। তখন সে বন্ধু গরুকে বললে, শুনতে পাচ্ছি কাল তোমাকে কাটবে আর রেঁধে খাবে। তোমার দ্বারা তো আর কোনও কাজ হচ্ছে না, তাই। সে ভীত হয়ে বললে, তবে রক্ষা পাই কি করে? ঘোড়া বললে, তা' হলে আর পা ছুঁড়ো না। তার পরদিন গরুকে আবার হালে জোতে (সকলের উচ্চ হাস্য)।

কিন্তু শিক্ষকের মুখে কথা নাই, হাসিও নাই। শ্রীম এক একবার সস্নেহ কৌতুক দৃষ্টি স্ফীত নয়নে শিক্ষকের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন। শিক্ষকের মুখমণ্ডল অভিমানের কৃষ্ণ মেঘে আবৃত।

শ্রীম আর একটি গল্পের অবতারণা করিলেন, রঙ্গরসের আবরণে উপদেশপ্রদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটা লোক ছিল। তার পরিবার বড়

জ্বালাতন করে। কিছুতেই মানাতে পারছে না। সে অতিষ্ঠ হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল — মর্কট বৈরাগ্য নিয়ে। এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলেছে। রাস্তায় একটা নদী পড়েছে। সেটা পার হতে হবে। বসে আছে, নৌকো এলে পার হবে। মন বড় বিষণ্ণ। সন্তানের উপর ভালবাসা রয়েছে। স্ত্রীর কথাও মনে পড়ছে। এই সব ভাবছে বসে বসে। ঐ সময় একদল মোরগ মুরগী চরতে চরতে সামনে এসে হাজির হলো। পাশেই গ্রাম। ঐ দলে ছিল একটা মোরগ আর আটটা মুরগী। এক একটা মুরগী পালিয়ে যেতে চায়। তখন মোরগ দৌড়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে এক ঠোক্কর। এমনতর কয়েকবার হলো।

ঐ দেখে ঐ লোকটার চৈতন্য হলো। সে ভাবছে — কী! এই একটা মোরগ তার আটটা পরিবারকে বশে রাখতে পারছে, আর আমি একটাকে পারছি না রাখতে বশে! এই ভেবে সে ঘরে ফিরে এলো। যেই এই মোরগ-নীতি অবলম্বন করলো, সব ঠিক হয়ে গেল। মধুরতার সহিত কঠোরতা (সকলের হাস্য)।

ভক্তসংগঠনে শ্রীম-র ইহাই রাজনীতি — এই অশ্ব-নীতি ও মুরগী-নীতি। ভক্তগণের যে কর্মে অরুচি, তাহাদের সেই কর্মেই নিযুক্ত করেন। যখন অনিচ্ছাজনিত ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয় তখন জ্ঞানখড়্গের এক আঘাতে ক্রোধমূল ছিন্ন করেন। তাহার পর উহাতে 'কথামৃত'-এর শান্তিময় সুমধুর 'হিলিং বামে'র প্রলেপ দেন। ইহার ফলে অনন্ত গুণ আনন্দলাভের পথে ভক্ত অজ্ঞাতে আরোহণ করে। অবতারের শক্তিতে শক্তিমান আচার্য ছাড়া, মানুষ কোথায় আর দেখিতে পায় এই প্রেমময় সহিষ্ণুতা, স্নেহময় দূরদৃষ্টি আর অহৈতুকী করুণা?

অতঃপরও শিক্ষকের মুখে হাসি নাই। অন্তরের অভিমান ভাঙ্গিলেও বাহিরের সাজানো আবরণ এখনও ছিন্ন হয় নাই। শ্রীম মায়ের মত স্নেহে বিগলিত হইয়া পুনরায় বলিলেন ভক্তদের — কাজ করলে হাসতে নাই বুঝি?

গদাধর — কেন, আপনিই তো বলেন মর্কট বৈরাগ্য ভাল।

শ্রীম — হাঁ। ঐ থেকে আবার ঠিক ঠিক বৈরাগ্যও হয়। সকাম থেকে নিষ্কাম হয়। ওর (বৈরাগ্যের) ভিতর গিয়ে পড়লে হয়ে যায়।

ত্যাগ আবার অনুরাগ — এই ঠিক বৈরাগ্য। শুধু সংসারত্যাগে হয় না। আবার অনুরাগ চাই ঈশ্বরে।

শিক্ষিক নির্বিকার। অভিমানের ক্ষীণ আবরণে গম্ভীর।

সভা ভঙ্গ হইল নয়টার পর। ভক্তগণ চলিয়া গেলেন। শিক্ষক তাঁহার টিনের ঘরে ঢুকিলেন। শ্রীম প্রবেশ করিলেন নিজ কক্ষে।

রাত্রি দশটা। শ্রীম শিক্ষককে ডাকাইলেন আপন কক্ষে। বলিলেন, কাল মায়ের জন্মতিথি। একটি লাল নরুণ পাড় ধুতি আনতে হবে, ধোয়া।

এই স্নেহস্পর্শে শিক্ষকের অভিমানের ক্ষীণ আবরণ ছিন্ন হইয়া গেল। শিক্ষক আনন্দে বলিলেন — আজ্ঞে হাঁ, কাল সকালেই নিয়ে আসবো। তারপর যাব মঠে।

গতকাল ১৬ ডিসেম্বর মর্টন স্কুলের প্রাঙ্গণে ছাত্র ও শিক্ষকগণ ল্যাণ্টার্ণ লেকচার শুনিতেছেন। বিষয় — 'হিস্ট্রি অব্ ব্রাহ্মসমাজ,' আর বক্তা — জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। শ্রীম সপার্ষদ বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য ছাত্রমণ্ডলীর ভিতর। মিহিজামের ছাত্র ও ভক্ত ঢাকার ফণিও কাছে বসা। ফণিকে দেখিয়া ভক্তরা মিহিজামের আনন্দময় জীবনের কথা স্মরণ করিতেছেন।

প্রভাতের বিস্তীর্ণ মাঠে সূর্যোদয়, রজনীর গভীর নির্জনতা, আর আচার্য শ্রীম-র মুখনিঃসৃত সুমধুর বেদবাণী — "ঠাকুরই সেই বেদপুরুষ, বেদ যাঁর গুণগান করে" — এই সকল মধুর স্মৃতি ভক্তদের হৃদয়ে পুনরায় জাগরিত হইল।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২রা পৌষ, ১৩৩১ সাল।
বুধবার, কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ৩৯।১৯ পল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আজ মঠে মা জীবন্ত — শ্রীম ও ম্যাকলাউড

১

বেলুড় মঠ। পৌষ মাস। কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। আজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিন। প্রতি বৎসর এই দিনে জগতের সর্বত্র মা সারদাদেবীর বিশেষ পূজা ও আনন্দোৎসব সাধু ও ভক্তগণ করিয়া থাকেন। আজ বেলুড় মঠে এই উৎসব হইবে।

ঠাকুর ও মা অভেদ বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ মনে করেন — যেমন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, অথবা শিব ও পার্বতী। কিম্বা, যেমন রাম ও সীতা, অথবা কৃষ্ণ ও রাধা।

কেবলমাত্র মানুষের বুদ্ধিতে এই তত্ত্ব নির্ণীত হয় না — যে বুদ্ধিকে ঠাকুর নাম দিয়াছিলেন রাঁড়ীপুতি বুদ্ধি, চিঁড়াভেজা বুদ্ধি, হীনবুদ্ধি বা বিষয়বুদ্ধি। অর্থাৎ, যে বুদ্ধিতে কেবলমাত্র সাংসারিক অভ্যুদয় মাত্র সাধিত হয়। যার সহায়ে মানুষ জাগতিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। উচ্চ পদে আরোহণ করে। বিশ্ববিজয়ী বীর হয়। অপরিসীম শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়।

অর্থাৎ, ঈশ্বর কর্তা মানুষ অকর্তা। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা, ঈশ্বরই জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামীরূপে জীবজগতের অন্তরে থাকিয়া এই বিশ্বকে পরিচালনা করিতেছেন — ইহা যে বুদ্ধি স্বীকার না করে।

অথবা, যে বুদ্ধি এই তত্ত্ব স্বীকার করে, কিন্তু অবতারতত্ত্ব স্বীকার করে না, যেমন দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ রামকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সেই বুদ্ধিরও কার্য নয় ঠাকুর ও মা এক অভেদ বস্তু বুঝা।

ভগবান যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হন জগতের কল্যাণের জন্য, ‘পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে

যুগে।।' (গীতা ৪:৮)। যে বুদ্ধি গীতার এই প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে, অর্থাৎ অবতারতত্ত্ব, সেই বুদ্ধির নিকট প্রকাশিত হয় ঠাকুর ও মায়ের যুগ্ম অবতারত্ব।

অথবা, যে বুদ্ধি স্বীকার করে অবতারতত্ত্ব, কিন্তু বলে অবতার মাত্র দশজন, অথবা চব্বিশ জন। অথবা যে বুদ্ধি বলে, অবতার তো রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট। কিম্বা যে বুদ্ধি বলে, অবতার একমাত্র রাম, অথবা শ্রীকৃষ্ণ, অথবা বুদ্ধ বা ক্রাইস্ট — সেই বুদ্ধিরও কর্ম নয় বুঝা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা অভেদ।

তবে কোন্ বুদ্ধির অবগম্য এই তত্ত্ব, ঠাকুর ও মা অভেদ? ইহার উত্তর — যে বুদ্ধি স্বীকার করে ঠাকুরের বাণী সত্য ও অভ্রান্ত, যে বুদ্ধি স্বীকার করে মায়ের বানী সত্য ও অভ্রান্ত, যে বুদ্ধি স্বীকার করে ঠাকুর ও মায়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আচরণ সত্য ও অভ্রান্ত।

আর কোন্ বুদ্ধি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা এক, অভেদ ও অভিন্ন তত্ত্ব, তাঁহারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি — এই তত্ত্বনির্ণয়ে সহায়ক? ইহার উত্তর, যে বুদ্ধি গ্রহণ করে — যেমন বেদের পরই স্মৃতির স্থান — সেইরূপ বেদতুল্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর পরই তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের বাণী। যাহারা সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রমবাসী কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের 'চাপরাশ'-ধারী। যাহারা শেষ অসুখের সময় তন মন ধন, এই সবগুলি দিয়া কিম্বা যে কোনও একটা বা দুইটা দিয়া, শেষ পর্যন্ত তাঁহার সেবা করিয়াছে। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রকটের পরও যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনসর্বস্ব রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নির্ধারিত পথে, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছে। যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ গুণগানে নারদতুল্য, তাঁহার বাণী সংরক্ষণে ও প্রচারে বেদব্যাসতুল্য। যাহারা জীবনধারণে জনক ও শুকদেবতুল্য। যাহারা, 'অসুখ কেন হলো? — না, অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বাছাইর জন্য, কে আপন কে পর বাছাইর জন্য, যে আপনার লোক সে যেমন সুখেও সঙ্গে থাকে তেমনি অসুখেও সঙ্গে থাকে, সেবা করে। আপনার লোককে কে ছাড়তে পারে? যারা সকাম তারা সব সরে পড়বে। তাই মা এ অসুখ দিলেন' — যাহারা, শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর জীবন্ত বিগ্রহ, জীবন্ত সাক্ষ্য। যে বুদ্ধি ইঁহাদের বাণী — স্মৃতি, পুরাণ বলিয়া গ্রহণ

করিবে সেই বুদ্ধির নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের অভেদ ও অবতারতত্ত্ব প্রতিভাত।

এই বুদ্ধিকে ঠাকুর 'খাসা বুদ্ধি' বলিতেন, পাকা বুদ্ধি। ঈশ্বর সম্পর্কিত বুদ্ধি, ব্রহ্মজ্ঞের বুদ্ধি, ঋষিদের বুদ্ধি, অবতারাদির বুদ্ধি। কেবল এই বুদ্ধিই মানুষকে পরমশান্তি দিতে পারে — পরমসুখ, অতএব পরমানন্দ দিতে পারে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।। (গীতা ২:৬৬)

যে ব্যক্তি (মন দ্বারা) ভগবানের সহিত যুক্ত নহে, তাহার বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। (অতএব সে ত্যাজ্য)। সে ব্যক্তির ভাবনা (চিন্তা) সদ্‌ভাবনা (ঈশ্বরমুখীন ভাবনা) নহে। অতএব, সে ব্যক্তির চিত্তে শান্তি নাই। আর শান্তিহীনের সুখ কোথায়? — গীতামুখে ভগবানের এই বাণী বিশ্বাস করে।

আবার শুনুন, ভগবান বেদমুখে কি বলিতেছেন।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।

(কঠো ১:২:৫)

(ঈশ্বরবুদ্ধিবিবর্জিত) মনুষ্যগণ অবিদ্যামায়ার ভিতর নিয়ত বাস করার ফলে নিজেদের মনে করে ধীর (শান্ত) আর পণ্ডিত (ব্রহ্মজ্ঞানী)। এই মূঢ়গণ নানা দুঃখ ভোগ করিয়া, একজন অন্ধ ব্যক্তি অপর একজন অন্ধ ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইয়া যেমন উভয়ে বিনষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই খানেই প্রশ্ন হইতেছে — না হয় আত্মজ্ঞের কথা মানিয়াই চলিব, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অনন্ত শান্তি সুখ লাভ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ তো বহু! কাহার কথা শুনিয়া চলিব? ভগবান বেদব্যাস তাহার উত্তর দিতেছেন মহাভারতমুখে — যে কোনও একজন মহাজনের বাণী অনুসরণ করিয়া চল, তাঁহার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চল — যিনি স্বয়ং অনন্ত শান্তি সুখলাভ করিয়াছেন — 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' — এই বাণী ধরিয়াছেন।

২

আমাদের আলোচ্য মূল বিষয়ে এখন ফিরিয়া যাই। মূল বিষয়টি হইতেছে — ঠাকুর ও মা অভেদ, যেমন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ, যেমন রাম ও সীতা অভেদ। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া অবতার।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলিতেছেন, 'আমি অবতার'। তাঁহার 'কথামৃত' বলেন, 'একদিন দেখি এর (শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের) ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বের হয়ে বলছেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই। এবার সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব।'

সন্দিগ্ধ নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, 'গিরিশ যে (অবতার) বলে তুই কি বলিস?' নরেন্দ্র বলিলেন, 'ওঁর বিশ্বাস উনি বলুন। আমি যতক্ষণ না বুঝবো নিজে ততক্ষণ বলবো না।'

কিছুদিন পরে রোগশয্যায় নিজের বুকে হাত দিয়া তারপর ঐ হাতের তর্জনী দিয়া ঊর্ধ্বে শূন্যে জগৎসূচক গোলাকার বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইসারায় — এর অর্থ কি? 'বুদ্ধিমতাম্ বরিষ্ঠঃ।' নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, 'আপনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা।' শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া ইসারাতেই আনন্দসূচক নেত্রসঞ্চালনের দ্বারা বলিলেন, এখন বুঝেছে।

অখণ্ডের ঘরের নরেন্দ্রের বুদ্ধি ইহা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু হৃদয় সংশয়মুক্ত নহে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম রোগশয্যায় মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে নরেন্দ্র ঠাকুরের বিছানায় বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, এখন বললে বুঝবো। তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল — 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' নরেন্দ্রের বুদ্ধি হার মানিল। কিন্তু হৃদয় এখনও সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত নয়।

নরেন্দ্রের বুঝিতে দেরী হইল বটে। কিন্তু যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার লিখিত স্তবস্তুতি কবিতায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন — 'দাস তোমা দোঁহাকার'। যে সীতা-রাম, সেই ঠাকুর ও মা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে জগদম্বাজ্ঞানে পূজা করিলেন ফলহারিণী পূজার রাত্রিতে। পূজান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া জপমালা মায়ের চরণে সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন — হে জগদম্বে, আজ থেকে আমার কর্মকাণ্ড

সমাপ্ত কর।

শ্রীশ্রীমা যে জগদম্বা, মায়ের নিজের উক্তি তাহার প্রমাণ। বলরাম মন্দিরে 'দক্ষযজ্ঞ' যাত্রার অভিনয় হইতেছে। মা সতীর ভাবে ভাব-সমাধিতে বলিয়া উঠিলেন, 'ও মা আমি যাব না (যজ্ঞে)?' একজন সেবিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বললে মা?' মা উত্তর করিলেন, 'কিছু না। শুনে থাকলেও বলো না।'

রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া মায়ের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ঐ ভাবে বলিয়াছিলেন, 'যেমনটি বসিয়ে রেখে গিছলাম ঠিক তেমনিই রয়েছো দেখছি?' সেবক শুনিয়া বলিলেন, 'কি বলছো মা?' মা উত্তর করিলেন, 'কিছু না।' এখানে মা নিজে বলিতেছেন, তিনি সীতা। সীতার প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিব। কোয়ালপাড়া মঠে শুধু ঠাকুরের ছবি পূজা হইত। একদিন মা পাশে নিজের ছবি বসাইয়া দিলেন এই বলিয়া, সশক্তিক পূজা বিধেয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী সকল শিষ্যদের নিকট ঠাকুর ও মা যুগ্মাবতার, যেমন রাম ও সীতা।

আজ বেলুড় মঠে এই মায়ের জন্মোৎসব। মায়ের মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজা। নানা পত্রপুষ্পে মন্দিরের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ সুশোভিত। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া সাধুরা গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। এই মন্দিরের স্থানেই মায়ের পাঞ্চভৌতিক দেহ কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর পূর্বে অগ্নিসৎকার করা হইয়াছিল। সেই পবিত্র স্থানের উপরই এই মন্দির। গত বৎসর মায়ের জন্মস্থানের উপর জয়রামবাটিতে স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় অপর একটি মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। মায়ের পূর্বাবতার সতীর দেহ "একান্ন পীঠ" সারা ভারত ব্যাপিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এবারে ব্রহ্মশক্তির সমগ্র দেহ একই স্থানে সন্নিহিত। তাই, অত বড় মাহাত্ম্য এই মন্দিরের। 'উদ্বোধন'-এ যখন মা বাস করিতেছেন তখন নিত্য রজনীর শেষভাগে উঠিয়া গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গা মায়ের অতি প্রিয়। তাই গঙ্গাতটে এই মন্দির পূর্বমুখীন ও গঙ্গামুখীন। দুই পাশে মায়ের দুইজন প্রধান সন্তান স্বামীজী ও রাজা মহারাজের সমাধিমন্দির। তাঁহারা যেন মায়ের দুইজন প্রহরী। তাই তাঁহাদের মন্দির পশ্চিমমুখীন। মা সিংহাসনে বসিয়া অহর্নিশ গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

ভক্তগণ দলে দলে আসিতেছে। কেহ কেহ মন্দিরের চারিদিকে বসিয়া আছে — ধ্যান জপ করিতেছে। কেহ মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছে। আজ পূজা ভোগ ও হোম এই মন্দিরে হইবে।

দ্বিতলের ঠাকুরের মন্দিরে প্রধান উৎসব। ঐ স্থানে ঠাকুর ও মায়ের একসঙ্গে পূজা, ভোগরাগ ও হবন। মায়ের এই জন্মোৎসবের আনন্দ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতরই পর্যবসিত। বাহিরের লোক বিরল।

মর্টন স্কুলের ভক্তগণ সকলেই মঠের আজের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে শ্রীম-র অনুমতি লইয়া জগবন্ধু ও বিনয় আসিয়াছেন। যাহার যখন সুবিধা তখন আসিতেছেন, আজ 'অফিস-ডে', তাই।

৩

শ্রীম মঠে আসিলেন বেলা সাড়ে তিনটায়, ডাক্তার বক্সীর মোটরে। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়িতেও আজ উৎসব। শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে সেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজা স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে ঠাকুরের পবিত্র পাদুকা, কেশ-নখাদি রহিয়াছে। সেখানে মা কখনও মাসাবধি থাকিয়া স্বহস্তে ঠাকুরের পূজা করিতেন। তাই আজ শ্রীম-র ওখানকার পূজা সারিয়া আসিতে দেরী হইয়াছে।

শ্রীম মঠের ফটকে মোটর হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে স্বামীজীর মন্দিরের নিম্নতলে গিয়া দাঁড়াইলেন। করজোড়ে স্বামীজীর সমাধির উপরে দেয়ালে স্থাপিত শ্বেতপাথরের বৃহৎ ধ্যানমূর্তিকে নমস্কার করিতেছেন। সমাধি ছয় ফুট উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান। প্রস্থে ও উচ্চতায় চার ফুট। সমগ্র বেদীটি শ্বেতপাথরে মোড়া। মন্দিরের মেঝেতেও শ্বেত পাথর। দ্বিতলে ঠিক স্বামীজীর নিম্নের সমাধির উপরের স্থলটি একটি শ্বেত পাথরের অনুচ্চ বেদিকাদ্বারা আবৃত রাখা হইয়াছে, যাহাতে কেহ ঐ স্থানে পদচারণ করিতে না পারে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে নিম্নের সমাধি-বেদিকারই অনুরূপ। এই অনুচ্চ বেদিকার উপর একটি শ্বেত পাথরের বৃহৎ ওঁকার স্থাপিত। দ্বিতলের সমগ্র স্থান, অভ্যন্তর ও পরিক্রমা শ্বেত প্রস্তরেই মণ্ডিত। কিন্তু নিম্নতলের পরিক্রমাস্থল টাইলে আবৃত। দ্বিতলে উঠিবার দুইটি ইষ্টকনির্মিত সিঁড়ি বাহিরে

নিম্নতলের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে রহিয়াছে। পূর্বমুখী হইয়া মন্দিরের দ্বিতলে উঠিতে হয়। সম্মুখে মন্দিরগাত্র বাহিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা।

দ্বিতলটি বড় মনোমুগ্ধকর। উত্তর-পূর্ব কোণে দাঁড়াইলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন হয়। সুবিশাল উচ্চ দেশী ঝাউ বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। সমস্ত পূর্ব দিক বাহিয়া মা গঙ্গা কখনও উত্তরবাহিনী কখনও দক্ষিণবাহিনী, জোয়ার ও ভাঁটায়। গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটা নিত্য দুইবার হয়। প্রতিবারে জোয়ারের সামুদ্রিক জল চার ঘন্টায় গঙ্গাগর্ভ পরিপূর্ণ করে। তখন মন্দিরের পোস্তার সমান স্ফীত হয় গঙ্গাজল। প্রতি আট ঘন্টা ভাঁটার সময় গঙ্গা পূর্ব দিকে সরিয়া যায় পোস্তা হইতে প্রায় পঁচিশ হাত। গঙ্গা যখন জোয়ারে পরিপূর্ণ হয় তখনই অপর পাড়ের শোভা অতি মনোহর হয়। দ্বিতলে আরোহণ করিলে অপর পাড়ের শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থল কাশীপুর শ্মশান দেখা যায়। ঐ স্থানে ঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নিতে সমর্পিত হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র বেদিকা ঐ মহা পবিত্র স্থানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতলে দাঁড়াইয়া মার্কিন মহিলা, স্বামীজীর শিষ্যা ও 'ফ্রেণ্ড' ব্রহ্মচারিণী ম্যাকলাউড, বাংলা সরকারের উচ্চ কর্মচারী মিস্টার বেণ্টলীকে (Bentley) দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর শ্মশান দেখাইতেছেন।

শ্রীমকে দেখিয়াই মিস ম্যাকলাউড নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। আর অতি আনন্দে সপ্রেমে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিলেন। বলিলেন — হ্যালো, মিস্টার এম্! গুড্ ইভিনিং। শ্রীম হাত জোড় করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। এবার মিস্টার বেণ্টলীর সহিত পরিচয় করাইয়া বলিলেন, *Here is Mr. M., the Evangelist, a direct disciple of Sri Ramakrishna, the celebrated author of the monumental work, 'the Gospel of Sri Ramakrishna'. সামান্য কথাবার্তা হইতেছে।

---

* ইনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতলেখক ও তাঁর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীম। চিরস্মরণীয় মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এর সুবিখ্যাত রচনাকার ইনিই।

এবার সামান্য কথাবার্তা হইতেছে।

Miss Macleod — Well, Mr. M., what is your experience of Sri Ramakrishna? How did he speak to the people, in a dialectic form or in inspiration?

M. — He was always God-conscious. Never for a moment did he get detached from it. We watched him for twentyfour hours. Such a thing is not possible for an ordinary God-realised man. When God incarnates in human body then only such a phenomenon is possible. He declared that in his body Sachchidananda had descended on earth. One day he told me, 'Christ, Chaitanya and I are one and the same entity. Is this the temple priest or God — thinking thus, we got bewildered when his real nature was revealed unto us.

Miss Macleod — How did he speak to you?

M. — 'Mother of the Universe', he said, 'speaks through my tongue.' He spoke in inspiration. 'I am an illiterate man,' said he on several occasions, 'but Mother

---

মিস্ ম্যাকলাউড — আচ্ছা মিস্টার শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কি আমরা শুনতে পারি? তিনি লোকের সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্তা কইতেন — কথোপকথনছলে অথবা দিব্যভাবে উদ্দীপিত হয়ে?

শ্রীম — তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। এক মুহূর্তের জন্যও কখনও তাঁকে এই দিব্যভাব থেকে বিচ্যুত হতে দেখিনি। আমরা দিবানিশি চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে বলছি একথা। এই ব্যাপারটি একজন সাধারণ জীবকোটি ঈশ্বরদ্রষ্টার পক্ষে সম্ভব নয়। যখনই ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন, এরকম ঘটনা কেবল তখনই সম্ভব হয়। তিনি তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন — সচ্চিদানন্দ এই দেহে অবতীর্ণ। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'ক্রাইস্ট, চৈতন্য আর আমি, এই তিনই এক অবিভাজ্য সত্তা!' ইনি কি মন্দিরের পূজারী অথবা ঈশ্বর, — এই ভেবে আমরা গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম, যখন তিনি তাঁর সত্য স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকট করতেন।

মিস্ ম্যাকলাউড — তিনি আপনাদের সঙ্গে কিভাবে কথা কইতেন?

শ্রীম — তিনি বলেছিলেন, জগদম্বা আমার কণ্ঠে বসে কথা কন। এই দিব্যভাবেই তিনি কথা কইতেন। তিনি অনেকবার আমাদের বলেছিলেন, আমি

rushes heaps of knowledge from behind.'

About Christ also we read similar words. 'Whence hath this man, this wisdom?' 'Is not this the carpenter's son?' 'Never man spoke like this man,' 'For he taught them as one having authority.'

Miss Macleod — Mr. M. today is Holy Mother's birthday. Well, what was she to you?

M. — The same as Sri Ramakrishna God-incarnate on earth. He and the Holy Mother are one as 'I and my Father are one'.

The Master said, the Brahma and the Shakti are one. He illustrated this fact by the example of a serpent. When the serpent is in a coil, it is like the Brahma in his undifferentiated Absolute state. When the serpent moves on in a zigzag manner, that is, when she creates, preserves and destroys the world, it is the illustration of Shakti or the Primordial Energy.

'মুখ্যু', কিন্তু জগদম্বা পিছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন আমার মুখে।

ভগবান ক্রাইস্টের সম্বন্ধেও এইরকম কথা পড়েছি বাইবেলে। বড় বড় ধর্মবিশারদগণ বলতো, 'এই লোকটা কোথা থেকে এ গভীর জ্ঞান লাভ করলো?' 'এ তো নিরক্ষর সূত্রধরের পুত্র, নয় কি?' 'এর মত কথা কইতে আমরা কখনও কাউকে দেখিনি।' 'কারণ তিনি লোকদের উপদেশ দিতেন একজন উচ্চ অধিকারীর ন্যায়।'

মিস্ ম্যাকলাউড — মিস্টার শ্রীম, আজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি। আচ্ছা, আপনি কি দৃষ্টিতে মাকে দেখতেন?

শ্রীম — যে দৃষ্টিতে ঠাকুরকে দেখতাম ঠিক সেই দৃষ্টিতেই মাকেও দেখতাম। শ্রীভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ নররূপে। ঠাকুর ও মা অভেদ — যেমন 'আমার পিতা আর আমি (পুত্র ক্রাইস্ট) এক'।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ — এই সত্যটি তিনি একটা সাপের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিছলেন। সাপ যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে তখন তাকে অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলে কই। আর সেই সাপ যখন হেলেদুলে চলে অর্থাৎ, যখন তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন তখন তাঁকে শক্তি, আদ্যাশক্তি বলে কই।

It is this second state the Ultimate Energy which creates, preserves and destroys the universe. It is this Ultimate Energy, or Brahma-Shakti which incarnates in human body at times for the good of the world.

It is this Ultimate Energy which has incarnated in dual forms — as Sri Ramakrishna and Holy Mother. So these dual forms — Thakur and Ma, are one and the same in essence.

As Sri Ramakrishna said, 'the Mother of the Universe and I are one', so did Holy Mother say, 'Thakur (Sri Ramakrishna) and I are one'. Holy Mother is God-Incarnate.

শ্রীম এইবার বিদায় লইয়া মঠের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সঙ্গে মর্টন স্কুলের ভক্তগণ, সাধুগণ ও বাহিরের ভক্তগণ। ডান হাতে রাজা মহারাজের সমাধিমন্দির। শ্রীম মন্দিরের দরজায় রাজা মহারাজের মর্মরমূর্তিকে প্রণাম করিলেন। ইনি কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্বে মহাসমাধি গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীম-র অতি প্রিয়। রাখাল প্রথমে ছিলেন শ্রীম-র বিদ্যাশিষ্য, পরে হইয়াছেন গুরুভাই, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্ররূপে। 'রাখাল বর্ণচোরা আম। অত বুদ্ধি, সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।' — ঠাকুরের এই মহাবাক্য অনুসরণ করিয়া দিগ্বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' সাম্রাজ্যের অধীশ্বরপদে বরণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া ডাকিতেন। তাই বিশাল রামকৃষ্ণ-পরিবারের তিনি আদরের

এই দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ আদ্যাশক্তিরূপে তিনি বিশ্বের সৃজন পালন বিনাশ করেন। এই আদ্যাশক্তি অথবা ব্রহ্মশক্তিই জগতের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে নররূপে অবতীর্ণ হন।

এই আদ্যাশক্তিই এখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ঠাকুর ও মা রূপে অবতীর্ণ। অতএব এই দ্বৈতরূপ — ঠাকুর ও মা, মূলতঃ এক ও অভিন্ন সত্তা।

যেমন ঠাকুর বলেছিলেন, জগদম্বা আর আমি এক ও অভিন্ন, সেইরকম শ্রীশ্রীমাও বলেছিলেন, ঠাকুর ও আমি এক ও অভিন্ন। শ্রীশ্রী মা অবতার।

'রাজা মহারাজ'।

ঠাকুর রাখালকে সমাধিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখারূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তাই ভক্তরা তাঁহাকে কখনও স্নেহভরে 'রাখাল রাজা' নামেও অভিহিত করেন। বস্তুতঃ রাখাল রাজা ব্রজের বালককৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসখা অভেদ। এই জ্ঞানেই ভক্তগণ তাঁহাকে রাখাল রাজা নামে অভিহিত করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইলেও শ্রদ্ধায় সকলে তাঁহাকে 'রাজা মহারাজ' বলিতেন — যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে 'স্বামীজী মহারাজ' নামে অভিহিত করেন শ্রদ্ধায় ও প্রেমে।

এই রাখাল মহারাজ শ্রীম-র অতি প্রিয়। তাঁহার মহাসমাধির পর শ্রীম বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া। অনাহার ও অল্পাহারে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। আর রাখাল মহারাজের মন্ত্রশিষ্যদের বাড়িতে যাইয়া তাঁহার গুণগান করিতেন ও শুনিতেন। শ্রীম-র নিত্যকার ভক্ত-মজলিশেও রাজা মহারাজের গুণকীর্তন হইত। শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধও রাজা মহারাজের নামে লিখিয়াছিলেন।

শ্রীম মঠের পশ্চিম বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠেস দেওয়া বেঞ্চে বসিয়াছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ। ইনি ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্তান — কথামৃতের 'তুলসী'। তুলসী, হরি (তুরীয়ানন্দ) ও গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) ঠাকুরকে একত্রে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন, কখনও দক্ষিণেশ্বরে, কখনও কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে। তুলসী মহারাজ প্রচারার্থ আমেরিকাতেও কিছুকাল বাস করেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কর্মস্থল দক্ষিণ ভারত। বহু বৎসর ঐ অঞ্চলে বাস করিয়া বহু সন্ন্যাসী তৈরী করিয়াছেন, আর অনেক আশ্রম — বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলে। তাঁহার হেড কোয়ার্টার ছিল বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। তিনি সুবক্তা ও কথোপকথনে পারদর্শী। তিনি অতি সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া শ্রীমকে নমস্কার ও অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পাশে বেঞ্চে বসাইলেন। অনেককাল পর মিলন হওয়ায় উভয়েই আনন্দে কুশল-প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন।

শ্রীম এবার উঠিয়া দ্বিতলে ঠাকুরঘরে গেলেন। প্রণাম করিয়া দক্ষিণের বারান্দা দিয়া ধ্যানঘর ও পাশের ছাদ দর্শন করিয়া (ভক্তগণ ক্যামেরা

আনিয়াছিলেন, এখানে গোপনে শ্রীম-র ফটো লইলেন) পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইলেন ও ললাটে প্রসাদী রক্তচন্দনের তিলক ধারণ করিলেন। এখানেও ঠাকুর ও মা আজ পুষ্পসজ্জায় বিভূষিত। মঠের অধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ আজকাল মঠেই আছেন। কর্মসচিব স্বামী সারদানন্দ আজ মঠে আসিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার নিবাসস্থল মায়ের বাড়ি 'উদ্বোধন'-এও জন্মতিথি উৎসব। মহাপুরুষ মহারাজ বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাই শ্রীম-র সঙ্গে দেখা হয় নাই। শ্রীম মাত্র ঘন্টাখানেক মঠে ছিলেন।

শ্রীম এবার দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। স্বামীজীর ঘর দর্শন করিয়া পূর্বদিকের বারান্দার উত্তর প্রান্ত দিয়া ছাদে গেলেন। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। সঙ্গে অনেক ভক্ত ও সাধু। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঠাকুরের অন্যতম সন্তান এলাহাবাদ মঠে থাকিতেন। ইনি আজকাল মঠে রহিয়াছেন। ইনি ইঞ্জিনিয়ার, অতি মেধাবী ও সুপণ্ডিত। বলিষ্ঠদেহ, দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও বৃহদ্‌নয়ন ও অতি অল্পভাষী। শ্রীম তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, কলসী পূর্ণ হইলে নীরব। ইনি সূর্যসিদ্ধান্ত, নারদ পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থের অনুবাদক। পাশের ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া শ্রীমকে সাদরে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিয়া একটি চেয়ারে বসাইলেন। আর একটি চেয়ার আনাইয়া নিজে উহাতে বসিলেন। উভয়ে আনন্দে নানা কথা কহিতেছেন।

হরিপ্রসন্ন মহারাজ — মাস্টার মশায়, ঠাকুরও এক, তাঁর কথামৃত লিখবার লোকও এক। আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি স্বামীজীর কথার চাইতে আপনার কথায় ছেলেদের কাজ হচ্ছে বেশী। আর ভালও লাগে। তাই বলি, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন! জিজ্ঞেস করে জানলাম, মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

আপনাকে এই কথাটি বলবো মনে করেছি অনেক দিন থেকে। আজ সুযোগ হল তাই বলছি। সত্যিই পড়তে লাগে ভাল, যেন ড্রামা। যতবার পড়া যায়, নূতন মনে হয়। আর নূতন light (আলো) পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কথামৃত সম্বন্ধে স্বামীজীর চিঠির কথা মনে হচ্ছে।... I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you this great work. আর ঐ কথাটি — Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. (আমি এতদিনে বুঝতে পারছি, কেন আমাদের কেউ ঠাকুরের জীবনী লেখার চেষ্টা করে নাই। এই মহাকার্যটি আপনারই জন্যে রাখা ছিল। প্লেটোর লেখা সক্রেটিসের জীবনী প্লেটোময়। কিন্তু, কথামৃতের লেখক আপনি কথামৃতে একেবারে নিখোঁজ)।

শ্রীম (স্মিত হাস্য) — আলু পটল কেমন লাফাচ্ছে মা দেখ, ছেলে বলছে। জ্বাল টেনে নিতেই সব ঠাণ্ডা। এ সবই ঐ যাদুকরের ভেল্‌কি।

শ্রীম নিচে নামিয়া আসিয়া পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ লইতেছেন। তুলসী মহারাজ পূর্ব হইতেই আনাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এইবার বিদায়। তুলসী মহারাজ চন্দনতলায় মোটরে তুলিয়া দিলেন। মোটর ফটকের কাছে আসিলে শ্রীম নামিয়া গিয়া পুনরায় মায়ের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মন্দিরের ভিতর আলোর ঝাড় লাগাইতেছে সুহৃদ। সাধু ও ভক্তরা শ্রীম-র সঙ্গে ফটকে আসিয়া শ্রীমকে মোটরে তুলিয়া দিলেন — 'জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়' — ধ্বনিতে। মোটর চলিল কলিকাতায়। মর্টন স্কুলের ভক্তদের বলিয়া গেলেন, আজ মঠে রাত্রিবাস করা উচিত। মা আজ জীবন্ত জাগ্রত।

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ৩রা পৌষ, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী। ৩৯ দণ্ড। ৫৮ পল।

চতুর্দশ অধ্যায়

তাঁর দর্শনে অতিমানব

১

গতকাল বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি গিয়াছে। মর্টন স্কুলের ভক্তরা — জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি সারা দিনরাত্রি মঠে থাকিয়া উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। শ্রীমও কাল অপরাহ্নে ডাক্তার বক্সীর মোটরে মঠে গিয়াছিলেন অল্পক্ষণের জন্য। ফিরিবার সময় ভক্তদের বলিয়া আসিয়াছিলেন, "আজ মঠে মা জীবন্ত জাগ্রত। মঠে রাত্রিবাস করা উচিত।" মাঝে মাঝে তিনি ভক্তদের রাত্রিবাস করিতে পাঠাইয়া দেন। বলেন "সাধুদের catch (উপলব্ধি) করতে হয় best time-এ (সর্বোৎকৃষ্ট সময়ে) — যখন তাঁরা ধ্যানমগ্ন। তখন তাঁদের মন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয় — যেমন জোয়ারের সময় খালের জল আর গঙ্গার জল এক হয়।"

ভক্তগণ রাত্রিবাস করিয়া ফিরিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের নিকট সারাদিনের মঠের সংবাদ লইতেছেন। আজ সকালে বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে গেস্ট হাউসে যান মিস ম্যাক্‌লাউডের নিকট। পরে তাঁহার সহিত মঠে যান। লর্ড লিটন তাঁহাকে আত্মীয়ারূপে দেখেন। উভয় পরিবার বন্ধুত্বসূত্রে সংবদ্ধ।

আজ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ৪ঠা পৌষ ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, কৃষ্ণা অষ্টমী। ৩৯ দণ্ড। ২৩ পল।

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তরাও শ্রীম-র পাশে বেঞ্চে উপবিষ্ট। ছোট রমেশও বেঞ্চে বসা। তাহার পিছনে হাই বেঞ্চ। সে তাহাতে ঠেস দিয়া বসিয়াছে বেশ আরামে। শ্রীম-র দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীম কঠোর নীতিপরায়ণ। তাঁহাকে, ভক্তরা দীর্ঘকাল কাছে থাকিয়াও,

কখনও ঠেস দিয়া বসিতে বা আরাম চেয়ারে বসিতে দেখেন নাই। তিনি স্কুলে রেক্টারের আসনে হাতাহীন চেয়ারে ক্রমাগত ছয় ঘন্টা সোজা হইয়া বসিয়া থাকেন এই বৃদ্ধ বয়সেও, ভক্তরা বহুবার দেখিয়াছেন। এক মিনিটের জন্যও ঠেস দেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, কর্মক্ষেত্রে জ্ঞানী ভক্ত হইবে সিংহতুল্য। তাঁহার তখনকার চোখমুখের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মনে হইত, তিনি ঠাকুরের ঐ মহাবাক্যে প্রবুদ্ধ। এখন কথাবার্তা হইতেছে — লক্ষ্য ছোট রমেশ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সংসার weakling-দের (দুর্বলদের) জন্য নয়। স্বামীজী বলতেন, যারা বিপদে পড়ে নাই তারা যে baby (দুগ্ধপোষ্য শিশু)। যারা একটু কষ্টেতে নেতিয়ে যায় তাদের জন্য সংসার নয়।

দুঃখ বিপদ সর্বদাই লেগে আছে এটা জেনে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। তপস্যা করবে না। তা একটু আরাম ছাড়বে না। তা হলে কি করে শান্তি পাবে? শান্তি কেবল ঈশ্বরের কাছে আছে, আর কোথাও নাই। অপর শান্তি temporary (ক্ষণস্থায়ী)। যদি lasting (স্থায়ী) শান্তি চাও তবে তাঁকে ধর।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

এই অবসরে ভক্তরা vaccination-এর (বসন্তের টীকার) কথা উত্থাপন করিয়াছেন — ইহার উপকারিতা ও অনুপকারিতার কথা। শ্রীম অন্য কথা পছন্দ করেন না। তাই ঐ সব বাজে কথা বন্ধ করার জন্য ডাক্তার কার্ত্তিক বক্সীকে চৈতন্য-লীলামৃত পড়িতে বলিলেন। অন্তলীলা পাঠ চলিতেছে। ছোট হরিদাসের কথা উঠিয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেবের কি অভিপ্রায় এই ত্যাগে তাহা কে বুঝিবে?

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — এ শুনলে রাগ ধরে। এ আর বুঝতে পারছে না, কেন ত্যাগ করেছেন? সন্ন্যাসীর স্ত্রী ত্যাগ করতে হবে। এ বোঝা কি কঠিন?

হরিদাস তো লোক খারাপ নন, অবতারের পার্ষদ — লোকশিক্ষার জন্য এই কঠোরতা। মহাপুরুষদের হৃদয় 'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি।'

মাধবী বৃদ্ধা, আশির উপর বয়স। চৈতন্যদেবের সাড়ে তিনজন রসিক ভক্তের মধ্যে মাধবী আধজন। অতবড় ভক্তের সঙ্গে মেশাও চৈতন্যদেব পছন্দ করেন নাই। অপর তিনজন — রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর পুরী, (ইনি সন্ন্যাসী) আর শিখি মাইতি। মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী।

হরিদাস, মাধবী সবই এক পরিবারের লোক। তথাপি লোকশিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সন্ন্যাসীর আদর্শ অত উঁচু — এইটি দেখাইবার জন্য এই কাণ্ডটি!

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন তিনটা। শনিবারের ভক্তগণ একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। 'ভবরাণী' (ভোলানাথ), হরিপদ, ললিত রায় প্রভৃতি আসিয়াছেন। নিত্যকার ভক্তগণও আসিয়াছেন — বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, শচীনন্দন ও জগবন্ধু, ছোট নলিনী ও মনোরঞ্জন, শান্তি ও শুকলাল প্রভৃতি। সকল ভক্তগণ বসিয়া আনন্দ করিতেছেন।

বড় জিতেন একটি ভক্তকে ছয় আনা পয়সা দিলেন। তিনি কচুরি ও শিঙ্গাড়া আনিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ দিতেছেন। অনিবেদিত কোনও দ্রব্য ভোজন করিতে ঠাকুর মানা করিয়াছেন। তাই শ্রীম-র শিক্ষায় ভক্তরা নিবেদন না করিয়া কিছুই খান না। শ্রীম নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ। ধ্যান করিতেছেন।

আজ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ৫ই পৌষ, ১৩৩১ সাল। শনিবার, কৃষ্ণা নবমী তিথি। ৩৭ দণ্ড। ৩৪ পল।

এখন পাঁচটা। শ্রীম বাহিরে আসিলেন। রেলের সময় নিকটবর্তী। তাই শনিবারের ভক্তগণ শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। শ্রীম বলিলেন, আসুন তা হলে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'(গীতা ২:৪০)।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে সিঁড়ির ঘরে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে ডাক্তারকে চৈতন্য-লীলামৃত পাঠ করিতে বলিলেন। কিন্তু ডাক্তারের প্রশ্নে পাঠ স্থগিত রহিল।

ডাক্তার বক্সী (শ্রীম-র প্রতি) — এসব গ্রন্থ আপনি আগেই পাঠ করেছিলেন, কিম্বা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পর?

শ্রীম — না। এসব আগেই পড়েছিলাম যখন স্কুল-কলেজে পড়ি। কেশববাবুর নববিধান সমাজে যেতাম। তাঁর মুখে শুনে এসব পড়তাম।

একদিন কেশববাবু 'ভক্তিচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন বেদীতে বসে। আজও দেখছি, বসে পড়ছেন।

শিশিরবাবুর সঙ্গেও পূর্বেই দেখা হয়েছিল। ইনিই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা। তখনও 'অমিয়-নিমাইচরিত' লেখেন নাই। কীর্তন শুনতে নানা স্থানে যেতাম। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়। ইনি গৌরভক্ত ছিলেন।

শিশিরবাবু ঠাকুরকে দুবার বাড়িতে নিয়ে গিছলেন। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর ওঁদের বিষয়ী লোক বলায় পছন্দ হল না। এরপর আর গেলেন না (হাস্য)। ঠাকুরের শরীর গেলে শিশিরবাবুর ওখানে প্রায়ই যেতাম কীর্তনে।

শিশিরবাবুর একটা দল করার ইচ্ছা ছিল। আমায় বলেছিলেন, তুমি জনকয়েক লোক আনতে পার? আমি কিছু করি না দেখে বলেছিলেন — ও-ও তুমিও দেখছি দই খেয়ে ভাঁড়টা ফেলে দিচ্ছ (হাস্য)।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর চলে গেলে যেন পাগলের অবস্থা ভক্তদের! যারা সংসারে ছিল না, তারা প্রব্রজ্যায় বের হয়ে গেল। যারা ঘরে ছিল, তাদের জীবন্মৃতের অবস্থা। কয়েক মাস ঘরে কাটিয়ে দে দৌড়।

তখনই কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীর দর্শন হয়। জিলিপির চ্যাঙ্গারি হাতে দিলে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বালকের মত লুকিয়ে ফেললেন পিছনে — বালকভাব। কাশীতে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকেও দেখেছিলাম। বড় পণ্ডিত।

সেবারেই অযোধ্যা যাই। ওখানে একজন পরমহংস (রঘুনাথ দাস) দেখলাম। শান্ত আনন্দময় স্বভাব। তিনি প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন, কোথায় যাবে? ঘরে যাও। তাঁর জীবন, বাণী চিন্তা কর। তাঁর ধাম দর্শন কর। তখন ফিরি কয়েক মাস পর।

ইউনিভার্সিটির বারশ' পেপার হাতে। তিন শ' কোনও রকমে দেখি। বাকী কাগজ বেয়ারাকে দিয়ে রেজিস্টারকে পাঠিয়ে দি'। লিখি আমার মন বড় খারাপ। কাজ করা অসম্ভব। Risk (বিপদের ঝুঁকি) নিয়েই

করেছিলাম ঐ কাজ। তা ওঁরা আর কোনও step (আইন-অনুগ ব্যবস্থা) নিলেন না। মানুষ তো! ঠাকুরই তাঁদের মনের ভিতর প্রবেশ করে সব বুঝিয়ে দেন। এমনই শোক — বিরহশোক। দম বন্ধ হয়। কিছুই ভাল লাগে না। সবেমাত্র ঠাকুর চলে গেলেন। আপনারা এসব চিন্তা করতে করতে বাড়ি যান।

রাত্রি নয়টা। ভক্তরা অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, শচীনন্দন প্রভৃতি এখানেই রাত্রিবাস করেন। শচীনন্দন আজ ভক্তদের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন মিষ্টান্নের ভাণ্ডারা।

৩

মর্টন স্কুল। শীত কাল। অপরাহ্ন একটা। প্রাঙ্গণে স্কুলের ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণ একত্রিত হইয়াছেন। সিনিয়ার শিক্ষক বৃদ্ধ শ্যামলধন মিত্র মহাশয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাই তাঁহাকে অভিনন্দন দিতেছেন সহকর্মীগণ ও ছাত্রগণ।

শ্রীম স্কুলের রেক্টার। তিনিও যোগদান করিয়াছেন। মঞ্চের উপর চেয়ারে তিনি উপবিষ্ট। অভিনন্দন-পত্র পাঠান্তে তাঁহাকে ঐ পত্র ও অন্য উপহার প্রদান করা হইল। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। ছাত্রগণ সময়োপযোগী একটি বিদায়সঙ্গীত সমস্বরে গাহিল। সঙ্গীতের ভাব, এই সুযোগ্য ও কর্তব্যপরায়ণ আচার্য যেন ভগবৎ কৃপায় অবশিষ্ট জীবন শান্তি ও আনন্দে অতিবাহিত করেন।

শ্রীম চারতলার নিজ কক্ষে ফিরিয়া গিয়াছেন।

আজ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ৭ই পৌষ, ১৩৩১ সাল, সোমবার।

এখন অপরাহ্ন চারিটা। বড় জিতেন হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক। তিনি আজ হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময় এ্যাড্‌ভোকেট পঞ্চানন ঘোষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। পঞ্চাননবাবু আরও দুই একবার শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বড় জিতেন পঞ্চাননবাবুকে অন্তেবাসীর কাছে রাখিয়া বাড়ি গিয়াছেন। সেখান হইতে তাঁহার জন্য জলখাবার প্রেরণ করিয়াছেন। আহারান্তে পঞ্চানন ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথাবার্তা

কহিতেছেন। জিতেনবাবু ও ভক্তগণ কেহ কেহ আসিয়াছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ।

ভক্ত-মজলিশে প্রশ্ন উঠিয়াছে শান্তির উপায় কি? সকলেই আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। ফলে এক সিদ্ধান্তে সকলে উপনীত হইতে না পারায় উচ্চ রব হইতেছে। একটি ভক্ত অনুচ্চস্বরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ (গীতা ২:৬৬)

ইহা শুনিয়া সকলে শান্ত হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীম বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন পশ্চিম প্রান্তে চেয়ারে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ সম্মুখে ও বাম পাশে বেঞ্চে বসিয়া আছেন — বড় জিতেন ও পঞ্চানন, ডাক্তার ও বিনয়, শচী ও শান্তি, বুড়ো শিকদার, ছোট নলিনী ও ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু। শান্তি একটু পর চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। কথাপ্রসঙ্গ চলিতেছে।

বড় জিতেন — আমাদের বিচার হচ্ছিল কিসে শান্তি লাভ হয়। ইনি (অন্তেবাসী) গীতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। তার অর্থ, যার মন ঈশ্বরের সহিত লগ্ন নয় তার সৎ বুদ্ধি নাই, ঈশ্বরভাবনাও নাই। ঈশ্বরচিন্তাবিহীন লোকের শান্তি নাই। আর 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্।' যে অশান্ত তার সুখও নাই।

শ্রীম — হাঁ, ঠাকুরও বলেছিলেন, ঈশ্বরচিন্তা করলে শান্তি। তাঁর নামগুণ গান করতে করতে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি মানে, ভালবাসা — 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'।

একটি ভক্ত একটি গোলাপ আনিয়াছেন। তিনি শ্রীমকে উহা উপহার দিলেন। শ্রীম-র হাতে গোলাপ ফুল। তিনি ঈশ্বরীয় কথা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, লক্ষ্য বড় জিতেন) — আমরা কেন ডাকি তাঁকে? তিনি কি জানেন না আমাদের case (অবস্থা)? তবে কেন ডাকা?

বিশ্বাস কই? মন চারদিকে হিসেব করে বেড়ায়। অহংকার যে রয়েছে! তাঁরই দেওয়া অহংকার। যত দিন ওটা তাঁর দিকে না দেওয়া যায় তত

দিন অশান্তি, দুঃখ দৈন্য। তাঁর দিকে দিলে শান্তি, নিশ্চিন্তি।

ঠিক ঠিক হওয়া চাই। তা' চট্ করে হবার নয়। দীর্ঘকাল তাঁর পূজা, পাঠ, চিন্তা, করতে করতে মন তাঁর কৃপায় ঐ মুখী হয়।

তাঁর কিসের অভাব? আমরা ডাকি বা না ডাকি, তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — কি, বেদের ঐ শান্তিপাঠটি?

যুবক — ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

শ্রীম — এই শুনুন, ঋষিরা কি বলছেন তাঁর সম্বন্ধে। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবন মানে, সমগ্র বিশ্ব — একেবারে complete পরিপূর্ণ। ওতে খুঁত ধরবার উপায় নাই। যেখানে যা দরকার তাই দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদেরও কারো কারো এই মত।

এই পরিপূর্ণ বিশ্ব এসেছে পরিপূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বর থেকে। ঋষিরা বলেছেন স্তব করে, তিনি পরিপূর্ণ সর্ব বিষয়ে — জ্ঞান-ভক্তি-শান্তি-সুখ-আনন্দাদিতে, আর শক্তি-ঐশ্বর্যাদিতে, বুদ্ধি-বিচারাদিতে।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — পাঁচ টাকা আপনার বাক্সে আছে। বন্ধুকে তা দিলেন। কত অবশিষ্ট থাকবে?

ভক্ত — শূন্য।

শ্রীম — শূন্য। কিন্তু ঈশ্বরে এই Arithmetic (পাটিগণিত) কার্য্যকরী নয়। সমুদ্রের জল থেকে কত নদীর উৎপত্তি, কত নদী আবার তাতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু সমুদ্র স্থির, পূর্ণ।

ঈশ্বরের সঙ্গে finite (অন্তবান) কোনও জিনিষের তুলনা হয় না। তবুও অল্পবুদ্ধি লোকের মনে ঈশ্বরভাবনাকে বসাতে হলে এই দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে তুলনা করতে হয়। ঈশ্বর অতুলনীয়।

তাঁর কাজ মানুষ এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে কি বুঝবে?

একবার বরিশালে জলপ্লাবনে বহু লোক পশু পক্ষী সমুদ্রে ভেসে যায়। ঠাকুরের ঘরে বসে ভক্তরা সমালোচনা করেছিলেন। অশ্বিনী দত্তের পিতা ব্রজবাবুও ছিলেন। উনি বরিশালের লোক, জজ ছিলেন। অবসর নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। সমাধিস্থ ছিলেন ঠাকুর। নেমে এসে

এসব কথা শুনে বললেন, আমার বড় কষ্ট হয় এতে। ভগবানের সমালোচনা করতে নাই। ওঁরা সব বলছিলেন কিনা, ঈশ্বরের কি অবিচার!

ঠাকুর চুপ করাবার জন্য এঁদের বললেন, আচ্ছা যাদের তিনি নিয়ে গেলেন জলপ্লাবনে তাদের যদি আনন্দময় ধামে নিয়ে যান তা হলে তোমাদের বলবার কি আছে? তাই, না জেনে ঈশ্বরের কার্যের সমালোচনা করতে নাই।

শ্রীম একটু নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আর একবার বিদ্যাসাগরমশায়ের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, চেঙ্গিস খাঁর হুকুমে এক লক্ষ লোকের হত্যা হল। ভারতের এক লক্ষ লোককে বন্দী করলো। ফিরে যাবার সময় এদের সঙ্গে নিয়ে গেলেও বিপদ, খাওয়াতে পরাতে হবে। আর ছেড়ে দিলেও বিপদ, তার শত্রু বৃদ্ধি হবে। তখন তাদের বধ করলো। বিদ্যাসাগরমশায় বললেন, এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন। কই নিবারণের চেষ্টা তো করলেন না? বললেন, তিনি থাকেন থাকুন। আমার কোন দরকার বোধ হচ্ছে না তাঁর সম্বন্ধে।

ঠাকুর এই কথা শুনে বলেছিলেন, ঈশ্বরকে ঋষিরা বলেছেন, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন জগতের। কি জন্য বিনাশ করেন তা তিনিই জানেন। পূর্বাপর সব না জেনে তাঁর সমালোচনা করতে নাই, ঠাকুর বললেন। যাঁরা কতকটা জেনেছিলেন তাঁরা, সেই ঋষিরা — বলেছেন, এ তাঁর খেলা।

যদি বল তাঁর খেলা, আমার তো প্রাণান্ত। তার উত্তর, এই তুমিও যে তিনি। একমাত্র কর্তা, সত্য বস্তু, জগতে তিনি। তুমি কোত্থেকে এলে নূতন কর্তা?

পরীক্ষিতের এই সংশয় হয়েছিল, কেন কৃষ্ণ সমাজনিয়মের বিপরীত কাজ করলেন পরস্ত্রী নিয়ে রাসলীলায়। শুকদেব বলেছিলেন, তিনিই যে সব গোপী, গোপ। নিজের সঙ্গে নিজে খেলা করেছিলেন।

অহংকারের জন্য তো অবিশ্বাস, তা থেকে সংশয়। তা থেকে বিনাশ। এই অহংকারকে, ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে graft (সংযোগ) করতে। বলেছেন, দাসীভাবে সংসারে থাক। তা হলে শান্তি পাবে। যোগে থাকা।

তিনি আমাদের জন্মের আগের খবর জানেন। আবার মৃত্যুর পরের খবরও জানেন। তিনি স্বতন্ত্র, আর সব পরতন্ত্র।

৪

শ্রীম একটু নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যোগ মানে কি? না, এদিককার distraction-গুলি (প্রতিকূল দুশ্চিন্তাগুলি) থেকে মনকে উঠিয়ে অন্য দিকে, অনুকূল বাতাবরণে নিয়ে যাওয়া। একেই বলে যোগ। সংসার থেকে মনকে উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরে লগ্ন করা। বহু চিন্তা থেকে এক চিন্তাতে লগ্ন করা।

যোগীন্, মহাযোগীন্ — এইসব high sounding words-এর (বড় বড় কথার) মানে এই, মনটাকে এগুলো (সাংসারিক বিষয়) থেকে তুলে নেওয়া। আর তাঁ'তে বসিয়ে দেওয়া। নিয়ে বসাতে বসাতে ওখানেই বসে যায়।

শুধু কি একটি? চারটি — মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। এই মনেরই চার অবস্থা। কি অদ্ভুত mechanism (কার্যসাধনের ব্যবস্থা)!

ঠাকুর বলতেন, শিবের যখন সমাধি ভাঙ্গতো তখন, 'আমি কে, আমি কে' বলে নৃত্য করতেন।

এ সবই তাঁর কথায় চলছে — সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বেদে আছে (সুর সংযোগে) —

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (কঠো ২:৩:৩)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখ, অগ্নি সূর্য মেঘ বায়ু মৃত্যু এরা সব, মানে এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, চলছে তাঁর শাসনে। কত বড়, কত প্রবল পরাক্রান্ত এরা সব! কিন্তু সব তাঁর 'অণ্ডারে', ঠাকুর বলতেন।

এই প্রবলের প্রবলকে দর্শন করা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য, সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

তিনি আবার মানুষরূপ ধারণ করে আসেন। ঠাকুর বলতেন, 'আমি ওই'। ভক্তদের আবার দেখিয়েছেন তাঁর ওই রূপটি — ওই ভুবনমোহন রূপ, ওই অপরূপ জ্যোতির্ময় রূপ! ভক্তরা অবাক হয়ে ভাবতো — এ

কে এই পূজারীর ভিতর? এ দেব কি মানব?

(গানের সুরে) 'যে দেখেছে সে মজেছে, তার অন্য রূপ লাগে না ভাল।'

শ্রীম নীরব। আবার কথা। ভক্তরা অবাক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাঁর দর্শন হলে সব অন্যরূপ দেখায়। Common uncommon (সাধারণকে অসাধারণ) বলে বোধ হয়। Human superhuman, ordinary extra-ordinary, natural supernatural, conscious superconscious (মানবীয়কে অতিমানবীয়, সামান্যকে অসামান্য, প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত, সচেতনকে অতিচেতন) বলে বোধ হয় তখন।

তাই ঠাকুর বলতেন, ছাদে উঠলে দেখা যায় — যে ইঁট চুণ সুরকিতে সিঁড়ি হয়েছে, তা দিয়েই তৈরী ছাদ।

সব এক, সব চেতন। তখন এই সব সত্য বলে বোধ হয়।

কিন্তু সাধনের অবস্থায়, 'নেতি নেতি'। সব ছেড়ে যেতে হয়। তখন নজর থাকে বাইরের দিকে কি না, নাম-রূপে। তার পেছনে যে বস্তু রয়েছে!

বস্তু লাভ হলে এ সবই সে বস্তু — 'সর্বং সচ্চিদানন্দময়ং জগৎ', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। (ছান্দোগ্য উপঃ ৩:১৪:১)

একজন ভক্ত — এ সব কি করে বোধ হয়?

উত্তর — তপস্যায়। ঠাকুর এই পথে সব জেনেছিলেন। ভক্তদের তাই ইহা করতে বলতেন।

তপস্যা আর কি? এই প্রকৃতিজয়ের চেষ্টা। একান্তে বসে নিজের স্বরূপের চিন্তা করা। যে নিজের স্বরূপকে জানে, সে সব জানে। ঠাকুর জোর করে কাছে রেখে ভক্তদের দিয়ে তপস্যা করিয়ে নিতেন।

শ্রীমও ভক্তদের জোর করিয়া তপস্যা করাইয়া লন — কখন বুঝাইয়া, কখনও ধমক দিয়া, কখন অন্য উপায়ে। গতকাল তিনি শচীনন্দন, ছোট নলিনী, বিনয় ও জগবন্ধুকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপদেশ দিয়া পাঠান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐ তপোবনে এক একজন এক এক স্থানে বসে ধ্যান করবে। সবই তো জঙ্গল। কাউকে কেউ না দেখে। কেউ বেলতলায়, কেউ পঞ্চবটীতে। আর কেউ ঠাকুরঘরে। কেউ মা কালীর

সামনে। কেউ নাটমন্দিরে বসে ধ্যান জপ করবে।

আর বটতলার সংলগ্ন উত্তরের ভূমিখণ্ডে নিজেরা রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বনভোজন করবে। এই স্থানে ভক্তরা অনেকবার ঠাকুরের আদেশে বনভোজন করেছেন। ঠাকুরও ভক্তদের সঙ্গে বসে খেতেন। অনেকবার হয়েছে এমন। সামান্য আয়োজন। কিন্তু অসামান্য আনন্দ। ঠাকুর যে সঙ্গে! এসব করতে করতেই মন এদিক থেকে ওদিক যায়।

আর গঙ্গাস্নান করতে হয়। মা কালীর পূজা, দর্শন করতে হয়। ঠাকুরঘরে ধ্যান আর পঞ্চবটীতে পাঠ স্তবস্তুতি ধ্যান করতে হয়। এসব করতে করতেই মানুষ নিজেকে চিনে।

বড় জিতেনের হাতে গোলাপ ফুলটির প্রতি শ্রীম-র লক্ষ্য। তিনিই তাঁহাকে উহা উপহার দিয়াছেন।

শ্রীম (ঐ ফুল দৃষ্টে) — আহা, দেখুন কি সুন্দর! (একজন ভক্তের প্রতি) — কর দেখি, এমন একটি ফুল! কি সুন্দর পাপড়ি! এদিকে লাল, আবার ওদিকে সবুজ। কর না এমন একটি ফুল! তবে বুঝি কর্তার কেরামৎ। এ দেখলে আর কর্তাগিরি থাকে কি করে?

একটি মেয়ে এ দেখে কাঁদতে লাগলো — এখানে সবুজ আর ওখানে লাল। ঠাকুর তাকে যত বোঝাচ্ছেন সে তত কাঁদছে। কিছুতেই প্রবোধ মানছে না। আরও বেশি কাঁদছে।

আমরা তাঁরই হাতে পড়েছি। দুঃখ কষ্ট সব তাঁকে নিবেদন করা।

কথাটা হচ্ছে — যিনি বেঁধেছেন তাঁকেই বলা, খুলে দিতে।

পরমানন্দ ছেড়ে বিষয়ানন্দে মগন। আবার ঘুরে ফিরে পরমানন্দে যাওয়া। এই ব্যাপার।

নিজের শক্তিতে না কুলোয় যদি, গুরুকে সঙ্গে নাও। তাই তো এসেছেন গুরুরূপে ঠাকুর!

তাঁর আসার উদ্দেশ্যই এই, ভক্তদের তুলে নিতে। তোমার শক্তিতে যদি না পার গুরুশক্তি বরণ কর।

রাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
৭ই পৌষ, ১৩৩১ সাল। সোমবার, কৃষ্ণা একাদশী। ৩০ দণ্ড। ৪৭ পল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আনন্দের সন্ধানে রঘু

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। ডিসেম্বরের শেষ। এখন রাত্রি সাতটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন দরজার পাশে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ সামনে ও পাশে বসা বেঞ্চে — বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, ডাক্তার ও বিনয়, ছোট রমেশ ও ছোট নলিনী, 'ব্রুকবণ্ড' (যতীন) ও উকীল ললিত ব্যানার্জী, শান্তি ও বলাই, শচীনন্দন ও জগবন্ধু প্রভৃতি।

সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম হাততালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন। আজ বেশ দীর্ঘকাল ধ্যান চলিয়াছে। এখন কথাবার্তা হইতেছে। ছোট জিতেন গত রাত্রিতে বেলুড় মঠে ছিলেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — বলুন, মঠের সংবাদ বলুন। ঠাকুর এত কাছে একটি oasis (মরূদ্যান) বানিয়ে রেখেছেন ভক্তদের বিশ্রামের জন্য। সংসারও তাঁর রচনা, এই শান্তিময় বিশ্রামস্থলও তাঁরই রচনা। সংসারকে মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করেছেন মহাপুরুষগণ। ঠাকুরও সংসারকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলেছেন।

যে যত বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান হোক না কেন, এই অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে ঝলসিত হবেই হবে। অবতারগণও বাদ পড়েন না। দেখ না, রামের জীবন। আবার কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ক্রাইস্ট, চৈতন্যদেব ও ঠাকুর। কেউ বাদ পড়েন নাই।

তবে অবতারাদির ভিতরই শান্তির উন্মুক্ত প্রস্রবণ। সকলের ভিতরই এ'টি রয়েছে কিন্তু মাটিতে মুখ ঢাকা। চেষ্টা করে খুলে নিতে হয়। এই চেষ্টার নামই তপস্যা। এই প্রস্রবণটি হৃদয়বিহারী ভগবান — অন্তর্যামী!

মুখটি খুলে গেলেই শীতল জল। তখন এদিককার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড

কিছু করতে পারে না।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — কি সে অগ্নিকুণ্ডটি?

ভক্ত — শোকতাপ, দুঃখদৈন্য, অশান্তি, জরা ও মৃত্যু।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — হাঁ। শরীর ধারণ করলে এই সব আছে। আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। এসব হবেই। তা হলে খানিকটা রক্ষা — to be forewarned is to be forearmed.

যারা আগে থেকে প্রস্তুত থাকে তাদেরই বলে ভক্ত। এই ভক্তদেরই advanced group-কে, যারা আগে এগিয়ে গেছে, তাদের বলে সাধু। তারা বীর। তারা মৃত্যু পণ করে অবিদ্যার challenge-কে (আক্রমণকে) প্রতিরোধ করে।

যারা ঘরে আছে তাদেরই বলে ভক্ত। তাদের কেসটা (case) একটু জটিল। মনকে পেছন থেকে ক্রমাগত টানছে। কিন্তু তাদেরও খুব সুযোগ। ভগবানের ভাবনা তাদের জন্য বেশী।

ঠাকুর নিজ মুখে এ কথা বলেছিলেন। তেজচন্দ্র অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলেছে দেখে তাকে বলেছিলেন, তোর জন্যই আমার ভাবনা বেশী। একে তো নিজের মন কাঁচা। তার উপর আবার আরও কতকগুলি কাঁচা মনের খোরাক যোগাতে হবে তোকে।

এই সেকেণ্ড গ্রুপ ভক্তদের জন্যই মঠ — oasis, মরূদ্যান। ওখানে গেলে মনের বিশ্রাম হয়, আর শীতল জল মিলে। অত কাছে তবুও যাবে না। এমনি প্রকৃতি (লক্ষ্য বড় জিতেন)।

শ্রীম (প্রকাশ্যে বড় জিতেনের প্রতি) — 'মঠ' এই নামটা ভিতরে ঢুকলেই কত! শব্দের ভিতরও তিনি রয়েছেন অর্থরূপে। প্রত্যেক শব্দের connotation (গূঢ়ভাব বা অর্থ) আছে।

'মঠ' এ কথাটা কানে ঢুকলে মনে এই ভাবটা এসে পড়ে কিনা, যেখানে সব সর্বত্যাগীরা বাস করেন সেই স্থান। যাঁরা চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল সেই মহাত্মাদের স্থান।

কত বড় ঐশ্বর্য! কিন্তু সে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে না। কারণ? মন যে বিষয়মুখী। তাই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্যে অরুচি।

বিনা পয়সায় মিলছে এই ঐশ্বর্য। কিন্তু নেবার যো নাই। কেন? মন

যে হাবজাগুবজাতে ভর্তি! ওখান থেকে ওগুলি বের করে দিলে তবে নূতন উত্তম জিনিস রাখা যাবে। নইলে ওগুলি ফেলে দেয় এই উত্তম বস্তু। পেটখারাপ থাকলে, অজীর্ণ হলে, বমি হয়ে বের হয়ে যাবে যদি রসগোল্লা খাও।

তবে যদি মনে দৃঢ়নিশ্চয় হয় যে, ঐ জিনিস ভাল, তখন অল্প অল্প করে উহা সেবন করতে হয়। ক্রমে একটা taste (রুচি) হয়ে যায়।

ভাল লোকের কথা শুনে সাধুসঙ্গ করতে হয় — অনিচ্ছাসত্ত্বেও। অরুচি যাবে। ক্রমে রুচি আসবে। এ ছাড়া পথ নাই। সহজ পথ এই — ঠাকুর বলে দিয়ে গেছেন। বেশী চালাক হলে ঠকে যায়। গুরুবাক্য শুনতে হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — বলুন জিতেনবাবু, মহাত্মাদের কথা বলুন — 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা'। 'কিমাসীত ব্রজেত কিম্'। (গীতা ২:৫৪)

ছোট জিতেন — আজ সকালে মহাপুরুষ মহারাজ নিজের জন্ম ও বাল্যকালের কথা বলেছিলেন। সাধুরা সব প্রণাম করতে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন।

বললেন, কে একজন জ্যোতিষ বলেছিলেন, 'এই ছেলে খুব ভোগী হবে, রাজাটাজা হবে, নইলে সাধু হবে।' বললেন — ছি ছি, রাজা-ফাজা নয়, সাধু। এ বেশ। এই ঠিক। একজন সাধু বললেন, আপনি তো মহারাজ। রাজারও বড়। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন — হাঁ, এ মহারাজ ভাল, রাজ্যহীন মহারাজ। এ রাজ্যে মন ভগবানে থাকে সর্বদা। এ খুব ভাল।

একজন সাধু — আপনার জন্মের কথা, কখন হয় — এসব কথা ঘরে প্রায়ই হয়, আপনার কিছু মনে আছে কি — কোন্ সালে হয়?

মহাপুরুষ — না, বাবা আমার এসব কথা মনে থাকে না। হাঁ, একাদশীতে জন্ম, পৌষ মাস, কৃষ্ণ পক্ষ। সন তারিখ মনে নাই।

আমার মা নিজে রাঁধতেন। বাবা নিজ হাতে গরুর সেবা করতেন। আমাদের বাড়িতে অনেক ছাত্র থাকতো। মা তাদের নিজ ছেলের মত, নিজের হাতে রেঁধে, আমাদের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতেন। যা রান্না হতো

তাই একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হতো।

শ্রীম — তবেই তো অমন ত্যাগী ছেলে হয়। বাপ-মা'র গুণ ছেলেতে আসে। কখনও উল্টোও হয়। তবে বেশীর ভাগই আসে।

(দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া) তারক মহারাজ কখনও চান নাই। কিন্তু সকলে মিলে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দিল। কথায় বলে, রাজহস্তী যাকে পিঠে তুলে নেয় সে রাজা হয়। তিনি যাকে বড় করেন সে-ই বড়। মানুষের বানানো বড় শেষ অবধি টেঁকে না।

তারক মহারাজ থাকতেন অতি সামান্যভাবে। ময়লা কাপড়, দেহে মন নাই। বাইরে দেখলে মনে হবে নড়েভোলা (নির্ধন)। কিন্তু ভিতরে বৈরাগ্য। তীব্র বৈরাগ্য হলে দেহের দিকে খেয়াল থাকে না, যেন vagabond (ভবঘুরে), পরিব্রাজক।

বুদ্ধদেবের পোষাক ছিল, শ্মশানের পরিত্যক্ত বস্ত্র। একবার খুব অসুখ হয়, কিসের infection (সংক্রমণ)। জীবক তখন বহু যত্নে তাঁকে নীরোগ করেন। আর নূতন ভাল পোষাক পরিয়ে দেন। তদবধি সকল ভিক্ষুদেরও ভাল পোষাক পরার ব্যবস্থা হয়। বিশাখা নাম্নী ধনী ভক্ত মহিলা এই পোষাকের প্রথম ব্যবস্থা করেন বুদ্ধদেবের অনুমতি নিয়ে।

জীবক ছিলেন রাজবৈদ্য, আবার রাজপুত্র পাটলিপুত্রের। অল্প বয়সেই, তখন ষোল হবে, বুঝতে পারেন, এ রাজ্যে আমার অধিকার নাই। তাই পলায়ন করেন। হেঁটে তক্ষশীলায় গিয়ে উপস্থিত হন। কোথায় পাটনা, কোথায় তক্ষশীলা! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাছে। বর্তমান পাঞ্জাবের কৈমালপুর জেলায়। কমপক্ষে দেড় হাজার মাইল। হেঁটে গিয়ে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে — কুলপতিকে বললো, আমি অনাথ। পড়তে চাই। আপনার সেবা করবো। আপনি আমায় পড়ান।

ষোল বছর আয়ুর্বেদ পড়েন। শেষ পরীক্ষাও বড় অদ্ভুত। কুলপতি বললেন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, চারদিকে ষোল মাইল যাও লোকজন নিয়ে। যে সকল গাছ, লতা, গুল্মাদি ঔষধে লাগে না সেই সব কেটে নিয়ে এসো। একটিও লতাপাতা কেটে আনতে পারে নাই। তখন অধ্যক্ষ বললেন, আমার আর বিদ্যা নাই তোমায় দেবার। যাও ঘরে ফিরে যাও। আর রুগ্নদের জন্য এই বিদ্যার প্রচার কর। ততদিনে আচার্য প্রথমে

অনুমান করেন, পরে জানতে পারেন, জীবক পাটলিপুত্রের রাজপুত্র। এই জীবক বুদ্ধদেবের শিষ্য হন। আর রাজমন্ত্রী।

ললিত ব্যানার্জী উকীল। কানে কম শোনেন। উপরের কথোপকথন প্রায় শুনিতে পান নাই। শ্রীম উচ্চৈঃস্বরে তাই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — শিবানন্দ মহারাজের জন্মবৃত্তান্তের কথা হচ্ছে। মঠের প্রেসিডেন্ট। পিতামাতা খুব মহৎ লোক ছিলেন। তাই পুত্র অত বড় ত্যাগী।

২

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, লক্ষ্য বড় জিতেন) — অমন মঠ বানিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর ঘরের পাশে। তার advantage (সুযোগ) নেওয়া উচিত। অবতারের পার্ষদ, সিদ্ধপুরুষ ও সর্বত্যাগীগণ রয়েছেন ওখানে। যে যাবে সে-ই লাভবান হবে। সাধুসঙ্গ বৈ উপায় নাই। আমরা বুড়ো হয়েছি যেতে পারি না। তাই ফ্রেণ্ডদের মুখে শুনে নিই।

একটা ইন্দ্রিয় দিয়ে ঢুকলেই হলো। একটা তো পথ নয়। অতগুলি ইন্দ্রিয়। আমি তাই ফাঁকি দিয়ে শুনে নিই। দর্শন আরও ভাল। স্পর্শন, আলাপন, আবার হাত দিয়ে সেবা — এগুলি কাজে লাগালে আরও ভাল। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা — এগুলি কাজে লাগালে আরও ভাল। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা, দুই-ই চাই।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — অসুখ-বিসুখ তো আর নাই মঠে?

ছোট জিতেন — মহেশ মহারাজ অসুস্থ। দেখলাম সেবার ব্যবস্থা ভাল নয়। মঠে স্থান খুব কম। যে ঘরটায় আছেন অন্ধকার।

শ্রীম — এই শরীরটা থাকলেই কত সব। এই রামলালের (ভৃত্যের) অসুখ হলো, তাকে (হাসপাতালে) পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

এই রকম সকলেরই। আমাদের দেহটা রয়েছে বলে এই সব সুবিধা দেখছি।

শ্রীম নীরব, আবার কথা।

শ্রীম (স্বগত) — আবার খিচুড়ি খাওয়ান দরিদ্র-নারায়ণদের (হাস্য)।

কাছের দরিদ্র-নারায়ণকে সেবা করা যায় না, দূরের হওয়া চাই!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চলুন, এবার আপনাদের জগন্নাথে নিয়ে যাই।

(ডাক্তারের প্রতি) কই পড়ুন না আজও চৈতন্য-লীলামৃত। বেশ গ্রন্থ! ঠাকুর বলেছিলেন ভক্তি-গ্রন্থ পড়তে। এতে খুব ভক্তির কথা আছে।

ডাক্তার প্রথমে রঘুনাথ দাসের বিবরণ পড়িতেছেন।

পাঠক — রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের বড় জমিদার-পুত্র। বিশ লাখ টাকা আমদানী। জ্যেঠামশায় হিরণ্য দাস ও পিতা গোবর্ধন দাস। বংশে এই একটি মাত্র ছেলে। বাল্যকাল থেকে খুব ভক্তিমান। লুকিয়ে পেনেটির রাঘব পণ্ডিতের কাছে মাঝে মাঝে চলে যান। নিত্যানন্দ একবার তাঁকে ওখানে দেখতে পান। তিনি খুব আনন্দিত হন এই বালকের ভক্তি দেখে। আদর করে বলেন — ওরে রঘু, তুই চোর। লুকিয়ে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করছিস্। তোর অপরাধ হয়েছে। তোকে দণ্ড দিব। তুই ভক্তদের চিঁড়ার মহোৎসব করে খাওয়া। সেই থেকে এই মহোৎসব। নূতন মাটির মালসাতে। দই, চিঁড়া, আম ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পায় ভক্তগণ।

শ্রীম — ঠাকুর গিছলেন কয়েকবার। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশীতে হয় প্রতি বৎসর। ঠাকুর নৃত্য করতে করতে কখনও সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন।

ভক্তদের যাওয়া উচিত এই সব উৎসবে। ঐ স্থানে চৈতন্যদেবও এসেছিলেন। খুব উদ্দীপনের স্থান। ঠাকুর এসে ঐ প্রাচীন তীর্থে নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করে গেছেন।

পাঠক — রঘুনাথের সংসারে বিরাগ দেখে, তাঁকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিল যদি এতে মন সংসারে নেবে আসে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। রঘুনাথ দাসের মনে তীব্র বৈরাগ্য। বুঝতে পারলেন, সংসার পাতকুয়া আর আত্মীয় কালসাপ। আবার স্ত্রী পরমা সুন্দরী ষোড়শী। আহার শয়ন নাই। সদা অন্যমনস্ক।

বাড়ির লোক তাঁকে এক প্রাসাদে বন্ধ করে রাখে। রঘুনাথ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে পাগল। প্রাসাদের দরজায় দিবানিশি কঠোর প্রহরা। পলায়নের উপায় কি, রঘু তাই সদা ভাবে।

এক প্রভাতে কৃষ্ণ এক সুযোগ উপস্থিত করে দিলেন। বাড়িতে গৃহদেবতার মঙ্গলারতি হচ্ছে না। পূজারী আসে নাই। রঘু দারোয়ানকে কঠোর তিরস্কার করতে লাগলেন — যাও, শীঘ্র পূজারীকে ডেকে আন। কিন্তু তার উপর কর্তাদের হুকুম, এক মুহূর্তও স্থান ছাড়া না হয়। তিরস্কারের বর্ষণে প্রহরী অতিষ্ঠ হলো। রঘু বলেন, হয় তুমি যাও, ডেকে আন পূজারীকে, নয়তো দরজা খুলে দাও আমি গিয়ে ডেকে আনি। প্রহরী বুদ্ধিভ্রষ্ট হল। সে ভাবল, সত্যই তো মহা অপরাধ হচ্ছে। ভগবানের মঙ্গলারতির দেরী হয়ে যাচ্ছে। এতে তো মহাপাপ হচ্ছে। সে ভাবল, আমি তো যেতে পারি না মনিবের হুকুম ভেঙ্গে। এদিকে পূজার অপরাধে পাপ। রাজকুমার গিয়ে পূজারীকে নিয়ে এলে উভয় পক্ষ রক্ষা হয়। বাস্তবিক, এই অপরাধে কুমারবাহাদুরও অস্থির হয়ে পড়েছেন। পাপপুণ্যের বিচারজালে জড়িতবুদ্ধি প্রহরী। সে দরজা খুলে দিল।

পড়ে রইল মঙ্গলআরতি। পড়ে রইল পিতা মাতা, পড়ে রইল পরমা সুন্দরী যুবতী পত্নী, পড়ে রইল রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ — নবযুগের সিদ্ধার্থ চলল মুক্তির সন্ধানে। 'কারাগারাৎ বিনির্মুক্ত চোরবৎ দূরতঃ বসেৎ' (মৈত্রেয়ী উপনিষদ ২:১১) — উপনিষদের এই মহামন্ত্র আশ্রয় করে রঘু ঊর্ধ্বশ্বাসে চলল জগন্নাথপুরী। রাজপ্রাসাদের কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন প্রহরীরূপী কৃষ্ণ। এখন রঘু চলল সংসার-কারাগার থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণাবতার মুক্তিদাতা কৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দেশ্যে পুরীতে।

একবস্ত্রে, নগ্ন দেহে, নগ্ন পদে রাজপুত্র নবীন সিদ্ধার্থ 'কারাগারৎ বিনির্মুক্ত' রঘু গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ছেড়ে চলেছে। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই — লক্ষ্য কৃষ্ণচৈতন্যে। আহার নই, নিদ্রা নাই, কিন্তু রঘুর ক্লান্তিও নাই। দিবানিশি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। পদ ক্ষতবিক্ষত। রুধিরধারা প্রবাহিত। ভ্রূক্ষেপ নাই রঘুর। রঘু আজ শাশ্বত পরমানন্দলাভে ব্রতী। রঘুর মনোমন্দিরে বসে আছেন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জ্যোতির্ময় সিংহাসনে।

এদিকে রাজপ্রাসাদ জ্যোতিহীন, শোকসাগরে নিমগ্ন। রঘুর মা উন্মাদিনী। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা জড়প্রায়। মন্ত্রীগণের পরামর্শে দ্রুতগামী অশ্বারোহীগণ নানা দিকে ছুটল রঘুর সন্ধানে। উন্মাদিনী জননী কঠোর

বাক্যে পতিকে ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, কেন তুমি রঘুর হস্ত পদ রজ্জুতে বেঁধে রাখলে না। হতবুদ্ধি, কিন্তু বিষয়জ্ঞানে সিদ্ধ পতিদেব উত্তর করলো — দেবী, এই পরমাসুন্দরী যুবতী বধূ আর আমার অতুল ঐশ্বর্য যাকে বাঁধতে অসমর্থ, রজ্জু বা শৃঙ্খল তার কাছে জীর্ণ, নগন্য এক লহর সূত্রবৎ।

এদিকে রঘু কত জনপদ ও কত নগর অতিক্রম করে চলেছে, কত বন, কত প্রান্তর, কত নদনদী পার হয়ে চলেছে — কোন দিকে নজর নাই। একমাসের পথ অতিক্রম করে মাত্র বার দিনে। নগ্নপদে চলায় অনভ্যস্ত, সুখের ক্রোড়ে পালিত ঊনবিংশবর্ষীয় রাজকুমার রঘুর পদদ্বয় ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। শরীর জীর্ণ শীর্ণ অনাহারে, অনিদ্রায়। মলিন বসন অঙ্গে। মুখমণ্ডল ভয়ভীত কালসর্পমুখমুক্ত মণ্ডুকবৎ। অথবা, সাক্ষাৎ যমস্বরূপ ব্যাঘ্রকবলবিনির্মুক্ত পলায়মান হরিণবৎ। হঠাৎ সম্মুখে দেখল বিশাল মন্দিরশীর্ষ। ভরসা জাগল মনে। হৃদয় আনন্দে পুলকিত। তবুও ভয় যদি বা চৈতন্যদেব আশ্রয় না দেন। যদি বা বলেন পুনরায় গৃহে ফিরে যাও।

রঘু গম্ভীরায় উপনীত। শ্রীচৈতন্যপদপ্রান্তে দণ্ডবৎ ভূপতিত। নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুতে বিগলিত। চৈতন্যদেব দেখে বুঝলেন, রঘু সংসার-কারাগার থেকে পলাতক। সস্নেহে শিরোপরি মঙ্গলহস্ত স্থাপন করে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'রঘু এসেছো, বেশ হয়েছে। এখন স্নানাহার করে পথশ্রম দূর কর।' সমীপবর্তী সন্ন্যাসী অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরকে বললেন, 'আজ থেকে রঘুর অভিভাবক তুমি'।

পুরীতে রঘুনাথ। পিতা সংবাদ পেয়ে একজন পাচক ও মাসিক দশটাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন চৈতন্যদেবের সম্মতিক্রমে। রঘু সপ্তাহে একদিন চৈতন্যদেবকে মধ্যাহ্নে ভিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিন পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কথাপ্রসঙ্গে বললেন, সন্ন্যাসীর অনুচিত পূর্বাশ্রম থেকে অর্থ গ্রহণ করা। জীবিকার প্রথম উপায় ছাড়লেন রঘু। এবার সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন রঘু। যে যা দিত তাতে উদর পূর্ণ করেন রঘু। চৈতন্যদেব ভক্ত সংসদে বললেন, 'রঘু কেন বেশ্যার মত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে?' শোনামাত্র এই দ্বিতীয় উপায়ও ছাড়লেন। তৃতীয় উপায় হলো আশ্রম থেকে মাধুকরী করা। তাতেও আক্ষেপ করে মহাপ্রভু বললেন, 'সাধুদের সেবা না করে তাঁদের অন্ন গ্রহণ করা অন্যায়।' উহাও ছাড়লেন রঘু। আর কি করেন? রঘু নিরুপায় হয়ে পরিত্যক্ত পর্যুষিত অন্ন মহাপ্রসাদ কাপড়ে

বেঁধে নিয়ে আসতেন। জলে ধুয়ে তাই আহার করতে লাগলেন। চৈতন্যদেব ইহা শুনে বললেন, 'বা, রঘু বেশ করছে।' একদিন রঘুর ভোজনের সময় হঠাৎ চৈতন্যদেব গিয়ে উপস্থিত হন, আর একমুঠো ঐ অন্ন নিয়ে আহার করেন। বলেন, 'বা রে রঘু। তুই যে নিত্য চুরি করে এই অমৃত আহার করছিস।' এই চতুর্থ উপায় অনুমোদন করলেন।

বার বৎসর রঘুর ট্রেনিং চলল এইভাবে পুরীতে।

এবার রঘু বৃন্দাবনে। রূপ সনাতনের উপর বৃন্দাবন উদ্ধার করতে আদেশ হয়। এরও পূর্বে যান বাংলার এক রাজা সুবুদ্ধি রায়। রূপ ও সনাতন দুই ভাই বাংলার নবাবের বিত্তমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ধর্মান্ধতার ফলে বৃন্দাবন বিধ্বস্ত ও বনাকীর্ণ, হিংস্র জন্তুর নিবাসস্থল। রঘুকে চৈতন্যদেব বলে দিলেন — 'গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। আর ব্রজের রাধাকৃষ্ণ ভজিবে।' প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে রঘুনাথ রাধাকুণ্ডের তীরে গভীর বনে বসে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম জপ করেন। মুখে অন্য কথা নাই, কেবল 'রাধাকৃষ্ণ'। বস্ত্র কৌপীনমাত্র আর আহার মাধুকরীর শুষ্ক রুটি। শেষের দিকে তাও ছাড়লেন। দিনে একবার মাত্র একটু ঘোল পাতার দোনায় পান করতেন। মহাকঠোরী সনাতনকেও হার মানিয়েছেন রঘুনাথ। একদিন সনাতন এসে বললেন, 'ভাই রঘু, কেন অত কঠোরতা? অল্প কিছু আহার কর।' শুনলেন না গুরুভাইয়ের এই অনুরোধ। শ্রীগুরুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন রঘু। তাঁর শিষ্য চৈতন্যচরিতামৃতের অমর লেখক কৃষ্ণদাস লিখেছেন, 'রঘুর নিয়ম যেন পাষাণের রেখা'।

পাঠ শেষ হইল। শ্রীম এবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই ভারতের ইতিহাস। এদেশে রাজ্য ছেড়ে ভিখারী হয় মানুষ, ভগবানলাভের জন্য। ভারত-সংস্কৃতির মধ্যমণি এইসব চরিত্র। যেমনি ত্যাগ, তেমনি তপস্যা, তেমনি গুরুবাক্যে বিশ্বাস! আহা এসব জীবনচরিত শুনলে অতি কঠোর শুষ্ক হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ। ৮ই পৌষ, ১৩৩১ সাল।
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী ২৬।১১ পল।

ষোড়শ অধ্যায়

যেন জলে-ভাসা চাঁদ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। ডিসেম্বরের শেষ। রাত্রি আটটা। শ্রীম দোরগোড়ায় চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র বামে ও সম্মুখে ভক্তগণ বসা। বড় জিতেন ও ডাক্তার বক্সী, মুকুন্দ, বিনয় ও জগবন্ধু, ছোট নলিনী, ছোট জিতেন ও বড় অমূল্য, রমণী, মনোরঞ্জন ও 'ব্রুকবণ্ড' যতীন প্রভৃতি আসিয়াছেন। ছোট জিতেন ও বড় অমূল্য দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। আর ছোট নলিনী গিয়াছিলেন কালীঘাট। সকলেই পৃথক পৃথক প্রসাদ আনিয়াছেন।

আজ ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ১১ই পৌষ ১৩৩১ সাল, শুক্রবার। অমাবস্যা ৯।২৬ পল।

আজ শ্রীম-র শরীর অসুস্থ। বড় জিতেন আসিয়াই কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — আজ বুঝি কিছু আহার হয় নাই?

শ্রীম — না, হয়েছে রুটি-টুটি।

বড় জিতেন (ডাক্তারের প্রতি) — ডাক্তারবাবু, রাত্রে ভাত খেলে বুঝি কারো কারো বাত হয়?

ডাক্তার ও বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — আপনি আজ রাতে ভাত খেতে পারেন, ও-বেলায় যখন হয় নাই।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই দেখ না, জল বায়ু খাদ্য নিদ্রা — এসব যতক্ষণ পাচ্ছি, তখন 'আমি'। এই সবগুলি একত্রে জড়িয়ে তবে এই wonderful consciousness (বিচিত্র চেতনা) 'আমি'। একটু না খেলে অমনি ঐ (অচল)।

বড় জিতেন — অবতারপুরুষও ঘুমোন। এমনি শরীর!

শ্রীম — এই heart, lungs, brain, nervous system (হৃদয়, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী) — এত সব নিয়ে এই 'আমি'-টি চলছে।

ডাক্তার — Heart, lungs, nervous system (হৃদয়, ফুসফুস, স্নায়ুমণ্ডলী) সবই পড়ে রয়েছে। অথচ একটি জিনিস নাই — vitality (জীবনী শক্তি), তখন মৃত্যু।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম — এ-ও আছে একটি। যেমন, সব ছোট ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সব গিয়ে বড় অগ্নিতে পড়ে তেমনি এই সব জীবজন্তু সব যেন ঐ ছোট স্ফুলিঙ্গের মত গিয়ে পরমব্রহ্মে মিলিত হল। বেদে আছে এ কথা। ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কি সেই মন্ত্রটি?

একটি যুবক — তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গা।
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে
তত্র চৈবাপিয়ন্তি।। (মুন্ডক ২:১:১)

শ্রীম — আবার আর এক রকমও আছে। ভাল কাজ, সৎ কাজ করলে নিত্যধাম লাভ হয়। একেই পুরাণে বলে বৈকুণ্ঠ। সেইখানে গিয়ে ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে থাকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন সাকার হোক্ নিরাকার হোক্ একটা নেও। একটা পথ ধরে গেলে অপরটায়ও যাওয়া যায়। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনিই দেখিয়ে দেবেন তাঁর অপর ঐশ্বর্য। সাকার থেকে নিরাকার, আবার নিরাকার থেকে সাকার। দুই-ই তাঁর ভাব। ঝগড়া না করে একটা ধরে চলা। তা হলেই কাজ হয়ে গেল। বলতেন, যাঁর সাকার, তাঁরই নিরাকার।

বড় জিতেন — যাঁদের সমাধি হয় তাঁরা নামার সময় কি নিয়ে নামেন?

শ্রীম — তিনিই একমাত্র আছেন। যিনি সৎ — তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ, তিনিই শান্তি ও প্রেম। সব তিনি। আবার যখন জগতের দিকে নজর পড়ে, কেউ কেউ দেখেন তিনিই এই সব জগৎ হয়ে আছেন।

জীবজগৎও তিনি, আবার জীবজগতের ভিতর অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করছেনও তিনি।

বিশ্বের অন্তরে ও বাইরে তিনি। আর এর উপরও অবস্থা আছে, তা-ও তিনি। জীবজগৎও তিনি, আবার সর্বোপাধিবিবর্জিত স্বরূপেও তিনি। আবার কেউ কেউ দেখেন, তিনি বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, আর ভক্তরা সেবক।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বলরাম মন্দিরে সমাধির পর ঠাকুর বলেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে কতকাল বসে আছি, কখন থেকে বসে আছি, কোথায় বসে আছি, তা মনে নাই।

Time আর space-এর (স্থান কালের) জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিছলো। মায়াতীত অবস্থা। একটু নিচে নেমেছেন তখনও নামরূপের, জগতের জ্ঞান ফিরে আসে নাই পূর্ণভাবে। সেই অবস্থায় বলেছিলেন, ন্যাবা লাগার অবস্থা।

কখনও একেবারে ডুবে যেতেন। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্রে ডুবে গিয়ে সমুদ্র হয়ে যায়। যেমন জলের বিম্ব জলে মিশায় — 'জল হয়ে সে মিশায় জলে'।

সে অবস্থা থেকে ফিরে এসে শিব যখন দেখতেন ঐ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নাম ও রূপে বিশ্ব হয়েছেন তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে নৃত্য করতেন।

ঠাকুরও বলতেন, তাঁর লীলা মানুষ বুঝতে পারে না। অনন্ত, অনন্ত লীলা। বলতেন, 'তাঁর মায়া বুঝতে যেও না, পারবে না। এলোমেলো।'

এদিকে বলছেন, আমি অবতার। আবার বলছেন — মা, তোমার শরণাগত। অবতার মানে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন। এর মানে কি? অর্থাৎ, এই শরীর দিয়ে মানুষ তাঁকে বুঝতে পারে না। সবটা বুঝবার দরকার কি? একটুতেই কাজ হয়ে যায়। অর্জুন দেখতে চেয়েছিলেন। একটু দেখালেন। তাতেই 'বেপথুঃ'। কাঁপতে লাগলেন। সয় না।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভই আসল কথা। এতেই তোমার problem solved (সমস্যার সমাধান) হয়ে যাচ্ছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তাঁর অন্ত পায় না। এর মানে হল, এঁরাও finite (অন্তবৎ, সসীম) যখন নাম-রূপে এসেছেন। তাই তাঁরা বুঝতে পারেন না infinite-কে (অসীমকে)।

কি আশ্চর্য! ঠাকুরের ভিতর একটুও অহংকার দেখলাম না। যেন কুয়াসার মত একটু নেওর (নীহার) রেখেছিলেন। তাতেই 'মা মা' করতেন।

শিকড়শুদ্ধ উপড়ে এসেছিল তাঁর অহংকার। যেটুকু ছিল সেটুকু বলতেন, মা রেখেছিলেন লীলাপ্রচারের জন্য, আর ভক্তৈরী করার জন্য।

কি করে লোক চেনে তাঁকে?

মথুরবাবু আর রাণী রাসমণি চিনেছিলেন। কিন্তু ছেলেরা, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি জানতো না। একবার কুঠিতে এসেছিল ত্রৈলোক্য, মেয়েমানুষ নিয়ে গান বাজনা করবে। ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে গেল। বললো, ছোট ভট্চাযমশায় গান শোনান। চিনতো না তাঁকে। ঠাকুরের অভিমান নাই। ডাকলো, অমনি গেলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আমি আগে মনে করতাম, বুঝি উনি আমাদের আপনার লোক। ও মা, ভেবে যত দেখি ততই অনন্ত, অনন্ত দেখতে পাই।

যখন মিশতেন আমাদের সঙ্গে, তখন একেবারে সত্যি সত্যি আমাদের একজন, যেমন পিতা বা মাতা। আবার এর পরই কোথায় গেল ঐ সম্বন্ধ! যেন অনন্ত সাগর হয়ে গেলেন, অপার অসীম! জ্ঞান-আনন্দ-শান্তি-প্রেমসাগর!

ভাগবতে আছে, চন্দ্রের কিরণ জলে পড়েছে। মাছগুলো মনে করে এটা আমাদেরই একজন। মাছ যত কাছে যায় প্রতিবিম্ব ভেঙ্গে যায়। জল জল দেখে। জলে তো চাঁদ নাই। চাঁদ অনন্ত আকাশে। তেমনি ছিলেন ঠাকুর।

কেউ মনে করতো গুরু, কেউ পিতা, কেউ মাতা। তাদের ঐ ভাব। এরই ফাঁকে ফাঁকে ঐ অসীম অনন্ত রূপ ধারণ করতেন।

যারা তাঁর এই অনন্ত ভাবটি ধরতে পারে তারা শরণাগত হয়ে পড়ে থাকে। দুঃখ-কষ্ট যতই হোক, তেমন বিচলিত হয় না। বলে, শরীর ধারণ করলে এ হয়ই। কিন্তু তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও। এরা নিষ্কাম ভক্ত। সকাম-রা এ ভাব বুঝতে পারে না। তারা বলে, দুঃখ কষ্ট দিও না, প্রভো!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বাইবেলে ভক্ত জোবের (Job) কথা আছে। শত পরীক্ষার পরও বললেন, God is good (ঈশ্বর মঙ্গলময়)।

রাজা ছিলেন। সব শয়তান হরণ করলো — রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ধন, ঐশ্বর্য সব। শেষে শরীরে গলিত কুষ্ঠ হলো। তখনও বললেন, God is good (ঈশ্বর মঙ্গলময়)। এই এক থাক্ ভক্ত।

ভক্তদের তিনি কষ্ট দেন majestic height-এ (অতি ঊর্ধ্বে, ঈশ্বরে) তুলবেন বলে। আর লোকশিক্ষার জন্যে।

পাণ্ডবদের কত কষ্ট! কিন্তু তাঁরা তাঁকে ছাড়েন নাই।

ঠাকুর গান গাইতেন —

হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা—যা হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডোবাবে॥

শ্রীম একটু দীর্ঘক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — জীবের 'আমি' যায় না। তাই বলেছেন, থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। অবতারের 'আমি' থাকে না। যেমন মূলো গাছ, শেকড়শুদ্ধ উপড়ে আসে। জীব যেন অশ্বত্থ গাছ। ঠাকুর বলতেন, হাজার কাট, ফেক্‌ড়ি বেরোবে।

মানুষ লম্বা লম্বা কথা কয়। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, সব তাঁর 'অণ্ডারে'। অর্জুন যুদ্ধ না করে পারলেন না। বলেছিলেন, যুদ্ধ করবো না। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন, দাদা পারবে না। তোমার প্রকৃতি করাবে। এই প্রকৃতির কর্তা যিনি, তিনি ঈশ্বর। এখন অবতার, শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ব্রহ্ম যেন অসীম অনন্ত সমুদ্র। অবতার যেন একটি canal (খাল) — তা' থেকে বেরিয়েছে।

ঐ সাগরের যা কিছু ভাল সব অবতারের ভিতর দিয়ে দেখা যায়। ঠাকুর বলতেন, যেমন গরুর বাঁট। এই বাঁট দিয়ে গরুর যা শ্রেষ্ঠ জিনিস দুধ, তা বের হয়। তেমনি অবতারের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের যা শ্রেষ্ঠ জিনিস — জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস, প্রেম সমাধি, মহাভাব — এ সব বের হয়।

অবতার না এলে এসব কিছুই মানুষ বুঝতে পারতো না। শুধু কথামাত্র হয়ে থাকতো। তাই মাঝে মাঝে আসেন। এই সেদিন এসে আমাদের সঙ্গে থেকে চলে গেলেন। তাঁকে ধরলেই ব্রহ্মকে ধরা হলো। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা — এই আর কি!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১১ই পৌষ, ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার, অমাবস্যা ৯।২৬ পল।

সপ্তদশ অধ্যায়

আজ বাবু নিজে এসেছেন

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম-র শয়ন কক্ষ। ডিসেম্বরের শেষ। সকাল প্রায় সাতটা। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। জগবন্ধু, বিনয় ও গদাধর, আর বুদ্ধিরাম, নূতন লোক ও ছোট নলিনী শ্রীম-র ডানে ও বামে বেঞ্চে বসা।

'কথামৃত', চতুর্থ ভাগ ছাপা হইতেছে। অনেকগুলি প্রুফ আসিয়াছে। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিতেছেন, এইটে (৪১ নং ফরমা) দেখে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দিন। আর এঁকে (ছোট নলিনীকে) নিয়ে যান, উনি কপি ধরবেন। আপনি correct (শুদ্ধ) করবেন।

ভক্তরা দ্বিতলের ঘরে প্রুফ দেখিয়াছেন, উহা শ্রীমকে দিলেন। এখন আটটা।

হরনাথবাবুর প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই বড় জিতেনেরও প্রবেশ। তাঁহার সঙ্গে আঠার বছরের এক যুবক। হরনাথ হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেড্ মাস্টার।

শ্রীম (হরনাথের প্রতি) — আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। বসুন এই চেয়ারে। আমাদের উপনিষদ্ পাঠ হচ্ছে। শুনুন একটু বৃহদারণ্যক।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। সন্তান ছিল না। গৃহে দুই স্ত্রী — কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। বললেন, এই সব বিত্ত তোমরা ভাগ করে নাও। মৈত্রেয়ী জ্ঞানী ছিলেন। উত্তর করলেন — আচ্ছা, ধন দৌলত দিয়ে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারবো? অর্থাৎ আমার ঈশ্বরদর্শন হবে? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না। তবে আরামে সংসারে থাকতে পারবে; যেমন বড়লোকেরা থাকে। কিন্তু ভগবান লাভ হবে না — 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন' (বৃহ ২:৪:২)। তখন

মৈত্রেয়ী উত্তর করলেন, তবে আমি এই ধনসম্পত্তি চাই না। যাতে অমৃতত্ব লাভ হয় সেই উপদেশ করুন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রীত হয়ে মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, এই সংসারে পত্নী পতিকে ভালবাসে, সে কেবল পতির শরীরটার জন্য নয়। ভিতরে আত্মা, ভগবান আছেন, তার জন্যই ভালবাসা। তেমনি পত্নীর প্রতি পতির ভালবাসা। তেমনি সংসারের সব ভালবাসা। পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রে সব ভালবাসাই এইরূপ। 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'। আত্মা, ঈশ্বর ভিতরে আছেন বলে, অন্তর্যামীরূপে সবেতে ভালবাসা। যদি তা না হবে তবে মৃত শরীরটা কেন ভালবাসে না? (একজন ভক্তের প্রতি) কি আছে?

ভক্ত — ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া
ভবন্ত্যাত্মানস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
... ...
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য।
মৈত্রেয়ি আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন
মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২:৪-৫)

শ্রীম (হরনাথের প্রতি) — যদি বল, ভগবানবুদ্ধিতে আর কে ভালবাসে? এর উত্তর ঠাকুর দিয়েছেন। বলেছেন লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। তুমি জান না বলে সত্য অসত্য হবে? ঋষিরা এ সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — বিষয়ে মন থাকলে ব্রহ্মবস্তু লাভ হয় না। আসল কথা তাঁকে ভালবাসতে হবে। এদিককার সব ছাড়তে

হবে। ঋষিরা এসব সত্য নিজ চক্ষুতে দর্শন করেছেন, তারপর বলেছেন।

শ্রীম — ঠাকুর তাই বলতেন, কি বিচার করবো? দেখছি, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, ভাল মন্দ সব।

এই সৃষ্টি রাখবার জন্য স্ত্রী-পুরুষে মিলন করাচ্ছেন। অজ্ঞানে তাই করছে।

বড় জিতেন — কিন্তু স্ত্রীপুরুষের ভিতর যে ভালবাসা হয়, এই দেহ নিয়েই তো সে ভালবাসা। তাই তো আমরা দেখছি।

শ্রীম মত্ত হইয়া গাহিতেছেন ঠাকুরের গান।

গান। শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা মা।
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না।।

শ্রীম — তাঁকে দর্শন হলে তখন উহা দেখা যায়। তখন ব্রহ্মানন্দের একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যায়, (আঙ্গুলে বিন্দুমাত্র দেখাইয়া) এমন, এইটুকু।

বেদে তাই ঋষিরা বলেছেন, ঈশ্বর আনন্দে এই বিশ্ব সৃজন করেন। আনন্দে পালন করেন। আনন্দে বিনাশ করেন। আনন্দ ছাড়া তাঁতে আর কিছু নাই। আনন্দ যে তাঁর স্বরূপ!

'আনন্দাধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিশংবিশন্তি।' (তৈত্তিরীয় - ভৃগুবল্ল - ষষ্ঠ অনুবাগ)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর যখন সৃজনের এই রূপটি প্রত্যক্ষ করতেন তখনই সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। তারপর নেবে এসে ঐ গানটি গাইতেন।

মানুষের দৃষ্টি আর কতটুকু? শুধু বাইরেটাই দেখে। স্থূলের উপর দৃষ্টি। তারপর সূক্ষ্ম, তারপর কারণ, তারপর মহাকারণ, মানে ঈশ্বর। অত গভীর সব দৃষ্টি। মানুষের কোথায় সে দৃষ্টি?

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ঐ-টি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তো মৈত্রেয়ীকে বললেন, আত্মা আছেন বলে সব চলছে। তিনিই কার্য, তিনিই কারণ, আবার তিনিই কার্যকারণের উপর। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — লোকে free will, free will (জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বতন্ত্র ইচ্ছা) করে। কোথায় free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা)? সব God's will (ইশ্বরেচ্ছা)! জন্মের আগের খবর নাই, মৃত্যুর পরের খবর নাই। আবার বলছে কিনা free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা)!

(হরনাথকে দেখাইয়া) এই ইনি free will, free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বতন্ত্র ইচ্ছা) করেন। কোথায় free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা) দেখাও না। তলিয়ে যাও, দেখবে সব তাঁর will (ইচ্ছা)। তিনি অজ্ঞানের আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন নিজেকে। তাই লোক বলে, আমরা কর্তা। বস্তুতঃ তিনি কর্তা।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঠাকুর একটা গল্প করে এটা বোঝাতেন। বলতেন, এক জমিদার ছিল। তার অনেক নায়েব। এক এক কাছারীতে এক এক নায়েব। নায়েবরাই রায়তের সব বিচার করে। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে সব কথা শোনে। শুনে কারোকে শাস্তি দিচ্ছে, কারোকে পুরস্কার দিচ্ছে।

এখন একদিন জমিদার স্বয়ং ইন্‌স্‌পেক্‌শানে এসেছে। তখন জমিদার ঐ আসনে বসে আছে। আর নায়েব জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে আছে। রায়তরা বলছে, নায়েব মশায় — অমুকে আমার এই করেছে। অমনি নায়েব জমিদারকে দেখিয়ে বলছে — আমি না, ইনি। আজ বাবু নিজে এসেছেন, তাঁকে সব বল।

বড় জিতেন (আধ আধ স্বরে) — বাবু নিজে এসেছেন, তাঁকে বল, বাবুকে।

শ্রীম — এতদিনে নায়েব প্রত্যক্ষ বুঝতে পারলে যে আমি মালিক নই। মালিক জমিদার। আমি এতদিন তাঁর জায়গায় ছিলাম। আমি প্রতিনিধি মাত্র।

তেমনি free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা)। ভগবান-দর্শন হলে বোঝা যায় যে free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা) নয়। সবই ঈশ্বরেচ্ছা। তখন বোঝা যায় যে আমি একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রটা তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে। সে অবস্থাতে কোন শোক দুঃখ দারিদ্র্যবোধ থাকে না। দেখছে সবই তিনি করছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — এ (ওয়েস্টের) ফিলজফির কর্ম নয়। যারা ঐ ফিলজফি লিখেছে তারা যে সব ভোগী! সর্বস্ব ত্যাগ না করলে এ তত্ত্ব বোঝা যায় না। কখনও বুঝবে না।

দেখ না, জন্মের আগের খবর নাই। আবার মৃত্যুর পরের খবর নাই। আবার একটু শোকদুঃখেই জর্জরিত। এই অসহায় অবস্থা। এদিকে বলছে কিনা free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা)। কি beautiful inconsistency (চমৎকার অসঙ্গতি)!

সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন ঋষিরা। তাই তাঁরা বুঝেছিলেন এ তত্ত্ব — সব তাঁর 'অণ্ডারে'।

আমাদের হাতে ঋষিদের ফিলজফি। একে বলে দর্শন। ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন ক'রে সেটা লোককে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যুক্তিতর্ক দিয়ে। আগে দর্শন, পরে যুক্তি। কেবল যুক্তির স্থান নাই এখানে।

ঋষিদের বলে মন্ত্রদ্রষ্টা। চরম সত্য ভগবানকে দর্শন করেছিলেন তাঁরা। আর বুঝেছিলেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব চলছে। আবার তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। কর্তা, কারয়িতা, কার্য — সব তিনি।

বেদে আছে, 'তদৈক্ষত বহুস্যাম প্রজায়েয়'। আবার আছে, 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। আবার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি বহু হব। তারপর বহু হয়ে তার ভিতর অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করলেন। তাই, এই দৃশ্যমান অদৃশ্যমান বিশ্ব — সবই ব্রহ্ম। তাই ঋষিদের কথা আলাদা।

মোহন — যদি ঋষিরা সকলে একই চরম তত্ত্ব দর্শন করেছেন, তবে অপরকে বলবার সময় ঐ তত্ত্ব বিভিন্নতা প্রাপ্ত কেন হল? ষড়্দর্শন, বৌদ্ধ, জৈনদর্শন। আবার একই দর্শনের নানারূপ, যেমন বেদান্তদর্শন।

শ্রীম — মানুষের বুদ্ধি ভিন্ন। তাই যুক্তিতর্ক ভিন্ন। কিন্তু সকল দর্শনই বলে, এতে মানুষের অত্যন্তদুঃখ নিবৃত্তি হবে। কারণ দর্শনকারগণ সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। সকলেই শোকদুঃখ-বিজয়ী আর আনন্দময়।

কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা মেলায় গেল। তারপর সকলেই পৃথক পৃথক প্রবন্ধ লিখলো। যার মনবুদ্ধি যাতে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল সে সেই সব কথাই বেশী লিখল। রচনা ভিন্ন, মেলা এক, আনন্দও এক।

ঠাকুর এইটে বুঝিয়েছিলেন অন্য প্রকারে। বৃষ্টিতে ছাদে জল জমেছে। নানা নালী দিয়ে জল নিচে পড়ছে। কোনটায় বাঘের মুখ, কোনটায় সিংহের, কোনটায় মানুষের মুখ। এইরূপ নানা জীবের নানা মুখ ঐ সব নালীর মুখে রয়েছে। নানা মুখ দিয়ে পড়ছে। কিন্তু বস্তু এক — জল। সেইরকম নানা বুদ্ধির ভিতর দিয়ে একই ব্রহ্মবস্তু, চরম সত্য প্রকাশিত।

যদি বল, কেন এই সব বিভিন্নতা বুদ্ধির? তারও উত্তর আছে — মালিকের ইচ্ছা। বলেছিলেন, যার পেটে যা সয়, তাই মা রেঁধে রেখেছেন। যে কোন একটা পথ দিয়ে চললেই তোমার কাজ হয়ে যাবে, শোকদুঃখ জয় করতে পারবে। একটা পথ ধর।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝা দু'চার খানা ফিলজফির পাতা উল্টানোর কর্ম নয়। সর্বস্ব ত্যাগ করে, সদ্য পুত্রশোকাতুরা মায়ের মত যার অবস্থা হবে, সে-ই এ তত্ত্ব বুঝতে পারবে।

যে বুঝেছে, সব তাঁর ইচ্ছা, সে আর শোকমোহে অভিভূত নয়। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' সে মৃত্যুকে ভয় করে না — 'তে অমৃতাঃ ভবন্তি'।

শোকমোহ কিছুতেই কিছু করতে পারে না তাকে। কেন? না, সে জানে, এই যে সব করছি তা automatically (যন্ত্রবৎ) করছি। আমরা সব automations (যন্ত্রচালিত পুতুল)। না করে উপায় নেই তাই করছি। নিজের helpless condition (অসহায় অবস্থা) বুঝতে পারে তখন।

শ্রীম (হরনাথের প্রতি) — কই, free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা) যদি থাকে, তবে পুত্র উৎপাদনের সময় control (সংযম) কই? তাই আমরা completely (সম্পূর্ণরূপে) যন্ত্রবিশেষ — helpless condition (সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা) আমাদের।

'স মৃত্যুং জয়তি' — যে তাঁকে জানে, সে মৃত্যুঞ্জয় হয়। Death is the cessation of external relations with the internal অর্থাৎ বাইরের জল বায়ু খাদ্য, এর সঙ্গে ভিতরের যন্ত্রের — heart, lungs and stomach-এর (হৃদয়, ফুসফুস ও উদরের) সম্বন্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়াই মৃত্যু।

বড় জিতেন — তা হলে এসব (সংসার) তিনি করাচ্ছেন কেন?

শ্রীম — এই জন্য কিনা, এই সব compunctions-এর (প্রতিবন্ধনের) মধ্য থেকে crystallised (স্বচ্ছ, নির্মল) করে নেবেন বলে।

তিনিই কাউকে সাধু করে নাচাচ্ছেন। আবার কাউকে অসাধু করে নাচাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই জীবের অহংকার। আবার সাধুসঙ্গ, ব্রত, তীর্থ!

আমরা তাঁর হাতে যেমন বাজীকরের হাতে পুতুল।

তিনিই অনুশোচনা করাচ্ছেন, আবার করাচ্ছেন না। এতে নাক সিঁটকালে চলবে না, বাহাদুরী নাই কারো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই তত্ত্ব বুঝবে? তার জন্য করেছ কি? ঋষিরা সব ছেড়ে তাঁকে ডেকেছিলেন। কোথাও কিছুই করবে না, আর মাঝখান থেকে বুঝে নেবে?

যে বীর ইন্দ্রজিৎকে মারবে তার preliminaries (আয়োজন) কত! চৌদ্দ বছর আহার নেই, চৌদ্দ বছর নিদ্রা নেই, অটুট ব্রহ্মচর্য। তবেই ইন্দ্রজিৎকে মারতে পারে। কোথাও কিছু নেই আর অমনি হয়ে যাবে?

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — এই যে ওয়েস্টের ওরা 'free will, free will' (স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা) করে, কি ক'রে এটা বলে, আশ্চর্য হয়ে যাই! দেখছে যে — ক্রাইস্ট বলছেন, 'Thy will be done' (তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক)।

ক্রাইস্ট universal prayer-এ (সার্বজনীন প্রার্থনায়) কি বলেছেন? 'And lead us not unto temptations', 'And forgive us our debts (আমাদিগকে লোভে ফেল না। আর আমাদের অপরাধ মার্জনা কর)।

দেখ, ক্রাইস্ট এখানে বলছেন, সব তাঁর ইচ্ছা। আর এরা (খ্রীস্ট ভক্তগণ) বলছে, free will, free will (স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা)। কি beautiful inconsistency (চমৎকার অসঙ্গতি)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — 'Lead us not into temptations' (আমাদিগকে লোভে ফেল না) — এ কথাতে বোঝা যাচ্ছে, তিনি temptation-এতেও (লোভেও) নিয়ে থাকেন। তাই প্রার্থনা, যাতে না

নেন।'

ঠাকুরও বলেছিলেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না।' তিনি assume করে (ধরে) নিয়েছেন যে তিনি ভুলান। পরে প্রত্যক্ষ করেছেন যে তিনি ভুলান। তাই ব্যাকুল প্রার্থনা — ভুলিও না মা, মুগ্ধ ক'রো না।

দেখ, অবতারের কেমন কথা। তাঁদের ভাব ও ভাষাই আলাদা।

হরনাথ আনমনা হইয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার বয়স সত্তর। শ্রীম-র কাছে মাঝে মাঝে আসেন। ধর্মকথা শোনেন ও পড়েন। কিন্তু নীরস যুক্তিপ্রিয়। সাধনহীন, তাই অশান্ত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সব কথা কি আমাদের? ঠাকুরের কথা সব। তাই তো হৃদয়ে লাগে এতো। সকলে সইতে পারে না। (গদাধরের প্রতি) যাও, এই সব কথা ছাদে গিয়ে বসে ভাব।

এখন নয়টা। অন্তেবাসী দ্বিতলের ঘরে নামিয়া আসিয়া লিখিতে লাগিলেন সদ্যশ্রুত শ্রীম-র এই যুক্তিপূর্ণ ও জীবন্ত দেববাণী।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে কথামৃতের পার্শেল আজ পাঠাইতে হইবে। তাই বেলা এগারটা হইতে তিনটা পর্যন্ত শ্রীম ও অন্তেবাসী এই পার্শেলের কাজে ব্যাপৃত রহিলেন। তারপর ইহা পোস্টঅফিসে দিয়া অন্তেবাসী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এত হাঙ্গামা ব'লে, কেউ লিখলে আমি বলি — আপনাদের কোন ফ্রেণ্ড এখানে থাকলে, এখানে এসে বই নিয়ে যেতে বলবেন। যারা নিত্য এ কাজ করে তাদের সব ব্যবস্থা হাতের কাছে থাকে। হঠাৎ একদিন করতে গেলেই এই হাঙ্গামা। যার যা কাজ তার তাই করা উচিত।

এতে লাভ হচ্ছে, শিক্ষা হচ্ছে আপনাদের। যে কাজে হাত দিবে শেষ পর্যন্ত তাতে লেগে থাকা উচিত। এইটে প্রথম শিক্ষা। দ্বিতীয়, নিজের শক্তি ও প্রকৃতি বুঝে কাজে হাত দেওয়া। নইলে তামসিক কাজ হয়। তৃতীয়, আর সামনে যা এসে পড়ে তা করতেই হবে। চতুর্থ, একসঙ্গে পাঁচটায় হাত দিতে নেই যদি পেরে না ওঠা যায়।

একটা কাজ যে সুচারুরূপে করতে পারে, সে প্রয়োজন হলে খুব

বড় কাজও করতে পারে। আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেই সংস্কৃত মন ঈশ্বরের দিকে divert (চালিত) করলে, হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যাবে। ঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে কিনা — যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নামই মিছরীর হিসাব।

৩

এখন সন্ধ্যা। একটু শীত পড়িয়াছে। শ্রীম আমহার্স্ট স্ট্রীটে পায়চারী করিতেছেন। দক্ষিণে মেছুয়াবাজার স্ট্রীট আর উত্তরে আমস্‌ হাউজ, ঠিক সিটি কলেজের সম্মুখ পর্যন্ত পূর্ব ফুটপাথ দিয়া আসা-যাওয়া করিতেছেন। সঙ্গে মুকুন্দ ও জগবন্ধু, শান্তি ও বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরাম আজ ৺কামারপুকুর ও ৺জয়রামবাটী দর্শন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীম অতীব আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — ঠাকুরের কুটীরটি ঠিক আছে তো? দর্শন ও ধ্যান করেছিলে তো ওখানে বসে? ঠাকুরের নিজ হাতে লাগানো আম গাছটিকে আলিঙ্গন করেছিলে তো? হালদার-পুকুরে স্নান করেছিলে তো? ভূতির খাল, বুধাই মোড়ল, ধনীর কুটীর, চিনে শাঁখারীর ভিটা, এসব অবশ্য দর্শন করেছিলে? আর লাহাদের নাটমন্দির? এখানে ঠাকুর পাঠশালে পড়তেন। মানিক রাজার আম বাগান এখন কি রূপ? এখানে বাল্যলীলায় যাত্রা অভিনয় করতেন, সখাদের নিয়ে। আর জয়রামবাটীর পুণ্যপুকুরের জল এখন কেমন? ওখানে স্নান করেছিলে। ৺সিংহবাহিনী দর্শন করেছিলে তো? ইত্যাদি।

শ্রীম যেন জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন, 'নিজ নিকেতনের' কথায়। নিজের পরিবারের সংবাদগ্রহণে মানুষ যেমন উৎসুক ও ব্যাকুল, শ্রীম-র অবস্থা উহা হইতে সহস্রগুণ বর্ধিত। কেনই বা হইবে না? ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমকেই ঠাকুর প্রথমে ৺কামারপুকুরে পাঠাইয়াছিলেন। তখন তিনি কাশীপুরে অসুস্থ। কেন পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি স্বয়ং জানেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে বলিতে হইলে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভগবান, — এই জ্ঞান, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে তাঁহার দিব্য স্বরূপ দেখাইয়া শ্রীমকে কৃতকৃত্য করিলেও ঐ জ্ঞানের বাহ্য স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণলোকের

রূপ দেখানো বাকী ছিল। এবারে সেইটি পূর্ণ করিলেন। শ্রীম দেখিলেন, সমগ্র কামারপুকুর, উহার অধিবাসী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মৃত্তিকা, সব চিন্ময়, জ্যোতির্ময়। এই দিব্য জ্যোতির্ময় রূপদেখিয়া শ্রীম আনন্দে অভিভূত হইয়া যাহাকে সামনে দেখেন সকলকেই একেবারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিয়াছিলেন। শ্রীম-র শরীর-মনও জ্যোতির্ময় দেখিলেন। ব্রহ্মজ্যোতির বন্যা! বুঝিলেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জন্ম লইয়াছিলেন এই পুণ্য ভূমিতে, চিন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণধামে। শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্ময়, শ্রীরামকৃষ্ণধাম চিন্ময়, চিন্ময় লীলাস্থলী ঁদক্ষিণেশ্বর। ঁদক্ষিণেশ্বরধামকেও ঠাকুর শ্রীমকে দর্শন করাইয়াছিলেন চিন্ময়রূপে। তাই শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া সর্বদা বৃক্ষলতাকে পর্যন্ত প্রেমে আলিঙ্গন করিতেন। বলিতেন, এখানকার সব চিন্ময়, ধূলিকণা পর্যন্ত চিন্ময় — surcharged with spirituality.' শ্রীম আনন্দসমুদ্রে ভাসমান হইয়া আনন্দে ঐ পরমানন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণধামের মহিমা কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — A holy pilgrim fresh from the holy land! (মহাপুণ্যধাম হইতে একমাত্র প্রতিনিবৃত্ত মহাপুণ্যবান তীর্থযাত্রীকে দর্শন করুন।)

এরপর সারা জগতের লোক যাবে ওসব পুণ্যধামে। ভগবান জন্মেছেন কিনা ওখানে। তাই উহা অত বড় পুণ্যধাম, অত পবিত্র! যেমন অযোধ্যা বৃন্দাবন, তেমনি হবে এরপর।

(শান্তির প্রতি) তোমরা একে সঙ্গে নিয়ে হোটেল থেকে খাইয়ে আন। মহাতীর্থ দর্শন করে ফিরেছেন সাধু। তাঁকে খাওয়াতে হয়। এতে ভাল হয়।

শান্তি বুদ্ধিরামকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলে চেয়ারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন পূর্বাস্য, বারান্দার পূর্ব প্রান্তে। অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন। ইতিমধ্যে বহু ভক্তসমাগম হইয়াছে। সকলেই ধ্যানমগ্ন। সাতটার সময় শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়াছেন। আজকাল বসিবার ঘরে অন্তেবাসী প্রভৃতি ভক্তগণ বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। তাই ঐ ঘরের সম্মুখের বারান্দায় ভক্ত-মজলিশ বসিয়াছে। ঘরের পশ্চিম দরজায় পিছন

দিয়া শ্রীম উত্তরাস্য চেয়ারে বসিয়াছেন। আর ভক্তগণ বসিলেন তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণাস্য দুই সারি বেঞ্চে।

শীতকাল। শ্রীম-র মাথায় কম্ফোর্টার জড়ান, গায়ে সোয়েটার। তাহার উপর ওয়ারফ্লানেলের পাঞ্জাবী। বাদামী রং-এর একটা মোটা চাদরে দেহ আবৃত। শ্রীম-র সম্মুখের সারিতে বসিয়াছেন বয়োবৃদ্ধ শুকলাল ও বলাই, শান্তি, বুদ্ধিরাম ও মনোরঞ্জন, অমৃত ডাক্তার ও বিনয়। পিছনের সারিতে বসা 'ব্রুকবণ্ড' যতীন ও রমণী, ছোট নলিনী, বড় অমূল্য ও বড় জিতেন, গদাধর, মোটা সুধীর ও ভৌমিক। জগবন্ধু বসিয়াছেন ঘরের ভিতর, শ্রীম-র পিছনে। এইবার শ্রীম আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

শ্রীম — কই, বুদ্ধিরাম কোথায়? এখানে এসে সামনে বস। হাঁ, এঁদের সব প্রসাদ দাও।

এইটিন এইটিসিক্সে আমরা গিছলাম ৺কামারপুকুর সরস্বতীপূজার ছুটীতে। ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের মধ্যে আমরাই প্রথমে যাই ওখানে। ঠাকুর তখন কাশীপুর উদ্যানে অসুস্থ। ফিরে এলে ঠাকুরের কত আনন্দ! বলেছিলেন, দাও রঘুবীরের প্রসাদ দাও! হাতে দিলে মাথায় তুলে ঠেকালেন।

(বুদ্ধিরামের প্রতি) দাও না প্রসাদ ভক্তদের হাতে।

বুদ্ধিরাম শ্রীম-র সম্মুখে সব প্রসাদ ধরিলেন। শ্রীম চটিজুতা খুলিয়া যুক্তকরে প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিলেন। তারপর এক কণা মুখে দিলেন। বুদ্ধিরাম বলিলেন, এইটে বিশালাক্ষীর প্রসাদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রঘুবীরের প্রসাদ ঠাকুর গ্রহণ করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হাঁ তুমি বিশালাক্ষী গিছলে? সেই বিশালাক্ষীর প্রসাদ! তাঁর যেকালে বিশালাক্ষীর উপর মনোযোগ হয়েছে, বুঝতে হবে ওখানে দেবী জাগ্রতা। তিনিই তো ঐ রূপে ওখানে রয়েছেন। এই করেই তীর্থ হয়। কালে এই সব মহাতীর্থে পরিণত হবে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা তখন মনটিতে এমনি চশমা পরিয়ে দিছলেন, সব দেখেছিলাম জ্যোতির্ময়। ৺কামারপুকুরের পথঘাট, বাড়িঘর, গাছপালা, জীবজন্তু, পক্ষী সব জ্যোতির্ময়। মানুষ জ্যোতির্ময়। রাস্তায়

একটা বিড়ালকে দেখলাম জ্যোতির্ময়। অমনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। সবাইকে সাষ্টাঙ্গ। সব চিন্ময় — কি অদ্ভুত ব্যাপার!

ওসব তীর্থে গেলে ওখানকার লোকদের খাওয়াতে হয়। আমরা স্কুলের সব ছেলেদের বড় জিলিপি খাইয়েছিলাম। এটি ওখানকার প্রসিদ্ধ মিষ্টি (হাস্য)। ঠাকুর এটাকে লাটসাহেবের গাড়ীর চাকা বলতেন। খুব আনন্দময় পুরুষ ছিলেন কিনা! সবেতেই তাঁর আনন্দ!

যে ছেলেদের জিলিপি খাইয়েছিলাম তারা সব এখন প্রৌঢ়। বৃন্দাবনে গেলেও সেখানকার লোকদের খাওয়াতে হয়। অযোধ্যা, নবদ্বীপ গেলেও তা করা উচিত।

কি সরল সব লোক পাণ্ডারা! বৃন্দাবনে পাণ্ডা পা বাড়িয়ে দিলে। বলে, পূজা কর! আমরাও পূজা করলাম। এ এক ব্যাপার! বিচারে এর পাত্তা পাবে না, বিশ্বাসের ব্যাপার!

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — কোন্ রাস্তায় এলে গেলে?

বুদ্ধিরাম — রেলে তারকেশ্বর। সেখান থেকে জাহানাবাদ। তারপর কামারপুকুর হেঁটেই গেলাম।

একজন সব দেখালেন। ভূতির খাল, লাহাদের বাড়ি, মানিক রাজার আমবাগান, ধনী কামারণীর ভিটে, চিনে শাঁখারীর ভিটে, বিশালাক্ষী — এইসব দেখে তারপর জয়রামবাটী গেলাম। ফিরবার সময় আরামবাগে প্রভাকর ডাক্তারের বাড়ি হয়ে এসেছি।

শ্রীম — ভূতির খাল শ্মশান। ঠাকুর গভীর রাত্রে ওখানে বসে ধ্যান করতেন ঐ ছোকরা বয়সে। আমবাগানে বাল্যে যাত্রার অভিনয় হতো সখাদের নিয়ে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর কানে কানে) — আপনাদের কাছে গোপেনবাবুর দেওয়া যে সওয়া আঠার টাকা আছে, তা থেকে পাঁচটাকা আমায় দিন।

অন্তেবাসী পাঁচটাকা দিলেন।

শ্রীম (ডাক্তারের কানে কানে) — এটা আপনি বীরেনবাবুকে দিবেন।

গতকাল সন্ধ্যার সময় শ্রীম হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যান। অন্তেবাসী ভাবিত হইলেন। অনুমান করিলেন, হয়তো ঠনঠনে মা কালীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। অনুমান সত্য হইল। তারপরই শ্রীম অক্ষয় ডাক্তারের সঙ্গে গিয়া ট্রামে উঠিলেন। অন্তেবাসীও সঙ্গী হইলেন।

আজ সন্ধ্যায় অন্তেবাসী ঠনঠনে যান। বাজার হইতে কলা প্রভৃতি খরিদ করিয়া ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে শ্রীম অন্তেবাসীকে দেখিতে না পাইয়া শান্তিকে বলিলেন, "কই গেল"? শ্রীম মনে করিয়াছেন, হয়তো শ্রীম আজও গড়ের মাঠে গিয়াছেন এই ভাবিয়া, অন্তেবাসী তাঁহাকে খুঁজিতে গড়ের মাঠে গেলেন। শান্তি অন্তেবাসীর চারতলার টিনের ঘর দেখিয়া নিচে আসিতেই অন্তেবাসী ফিরিয়া আসিলেন।

৪

এখন সন্ধ্যা আটটা। অমৃত গুপ্ত আজ বড়বাজারে রতন সরকার পার্কে অনেক সাধু দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। কেহ ধুনী রচনা করিয়াছেন, কেহ গায়ে ভস্ম মাখিয়া শিব সাজিয়াছেন। কাহারও বা পরমহংস বেশ। ইঁহারা সব গঙ্গাসাগরযাত্রী। প্রতি বৎসর এইরূপ জমায়েত হন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

অমৃত — অত শীত, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নাই। খালি গা, কেবল ভস্মাবৃত। অনেক সাধু, বাগানটা ভর্তি। আবার চারদিকে রাস্তায়ও সব রয়েছেন। বড়বাজারের মারোয়াড়ীরা সেবা করে এঁদের।

বড় জিতেন — ভস্ম মেখে কি হবে?

শ্রীম — তা না হলে আমাদের উদ্দীপন হবে কি করে? চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। কেন? না, সেই আশ্রমের কথা মনে পড়েছে, যে আশ্রমে সর্বস্ব ত্যাগ করে মন ব্রহ্মলীন হয় — সন্ন্যাসের কথা। একটা কাগজের ছবি দেখে যদি উদ্দীপণ হয়, তবে এ দেখে হবে না উদ্দীপন — জীবন্ত মানুষ, আবার সর্বত্যাগী?

ওঁরা কি — এ বিচার করবেন যিনি তাঁদের জন্ম দিয়েছেন, পালন করছেন, আবার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনি। ওতে আমাদের হাত দেওয়ার, দেখবার কোনও অধিকার নেই। চাচা আপনা বাঁচা, ঠাকুর বলতেন।

বড় জিতেন (তিরস্কৃত হইয়া) — আজ বসে ভাবছিলাম, অহংকার যাবার নয়। তা হলে কি হবে?

শ্রীম — থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে — এইটে ঠাকুরের ব্যবস্থা। অবতারাদির অহংকার যায়। জীবকোটির যায় না। অবতারাদি যেন মূলোগাছ। টান, শেকড় শুদ্ধ উপড়ে আসবে, ঠাকুর বলতেন।

তাই তাদের জন্য, জীবকোটির জন্য, ব্যবস্থা — দাস হয়ে থাক। ঈশ্বরের দাস। তোমাদের সবের মালিক তিনি, তুমি নও। তোমার দাবী অন্নবস্ত্রের, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য নেহাৎ যা না হলে নয় তা'। বাকী সব ঈশ্বরের। তুমি ট্রাস্টী মাত্র।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিছু করতে বললে বন্ধু বেজার। লেকচারে হ'লে আর রক্ষে ছিল না। কিছু করতে হয় হাতেনাতে। তপস্যা করতে হয়। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলতে হয়। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনিই ধরিয়ে দেন। তখন দাসভাবে, পুত্রভাবে থাক। এতে অহংকার কিছু করতে পারে না — যেমন বালকের অহংকার।

তাঁর অধীন হয়ে থাকা, এটা হলো সার। ইংরেজীপড়া লোকদের এসব কথা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। তারা সব মুখেমুখে মেরে দিতে চায়, হদ্দ দু' পাতা পড়ে।

তা হয় না। খাটতে হয়। একটু কিছু করলেই তিনি কারো মুখ দিয়ে সব বলে দেন। অতবড় problem-টা (সমস্যাটা) নিমেষে solved (সমাধান) হয়ে যায়।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) — কাল ঠনঠনে গিয়ে মা কালীর কাছে একটু বসেছিলাম। ঠাকুর এত আনাগোনা করতেন ওখানে, তাই। আর এখানে আসা যাওয়া হচ্ছে। আর কিছু হবে না। এতে যা হবার হোক।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে, কথা শেষ হবার আগেই) — হে-হে-হে, এতে যা হবার হোক (শ্রীম ও সকলের হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে সকলের প্রতি) — ছেলেবেলায় আমারও মনে হতো, নমস্কার-টমস্কার কেন করে লোকে। আবার কান্নাকাটা করে ঈশ্বরের কাছে। ভাবতাম — আচ্ছা তিনি তো পিতামাতা, তবে তাঁর কাছে আবার এতো কেন? ছেলেবেলায় ছিল এ ভাবটি।

তারপর মাঝখানে কত কিছু দেখলাম। কান্নাকাটা কত কি! এখন দেখছি আবার, ছেলেবেলায় যা ছিল সেটি হচ্ছে।

তাইতো। তাঁরই তো ছেলে আমরা। তা'হলে, তিনিই তো জানেন কিসে ভাল হয়।

অনেকে শুনি, বাবা মাকে দু'বেলা প্রণাম করে। আমি মাকে কখনও নমস্কার করতে পারতাম না। ভারি লজ্জা হতো।

হঠাৎ শ্রীম-র গভীর ভাবান্তর হইল। অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া

রহিলেন। মন অন্তর্মুখীন। বদনমণ্ডলে আনন্দের ছটা। সম্পূর্ণ নির্বাক। ভক্তরাও সব মৌন। শ্রীম-র মুখমণ্ডলে দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ পর শ্রীম-র এই উন্মনা সমাধি ভাঙ্গিল। মধুর প্রেম-রঞ্জিত সুরে বলিতে লাগিলেন, "রঘুবীর, রঘুবীর, রঘুবীর।" মন বুঝি নিমেষে দিব্যধাম কামারপুকুরের দিব্যজ্যোতিসমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-লোক হইতে বুঝি বা আবার ফিরিয়া আসিল বাহ্য জগতে, ধামেশ্বর শ্রীরঘুবীরকে আশ্রয় করিয়া।

এই উন্মনা সমাধি, ঠাকুরের কৃপাদান। শ্রীমকে সমাধিপ্রসঙ্গে ঠাকুর অনেকবার জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি ওটা বুঝেছ তো? জগদম্বার নিকট ঠাকুর প্রার্থনা করিয়াছিলেন — মা, একে যখন তোর কাজের জন্য ঘরে রাখবি, মাঝে মাঝে দেখা দিস্। নইলে কি করে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে থাকবে। তাই শ্রীমকে ভক্তরা বহুবার দেখিয়াছেন, কথাপ্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া যেন হঠাৎ কোন আনন্দময় দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। আজও তাহাই হইল। শ্রীম 'গুপ্ত', তাই তাঁহার ভাবরাশীও গুপ্ত।

শ্রীম-র মন নিচে নামিল। বুঝি বা রঘুবীরের গান গাহিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু রঘুবীরের নামে তখনও কোন গান রচিত হয় নাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংসদে। শ্রীম কথা কহিতেছেন ঐ গান সম্বন্ধে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তখন আমার বয়স ছয় বৎসর। দেবেন ঠাকুরের বাঁধা একটি গান শুনেছিলাম। রাস্তা দিয়ে গেয়ে যাচ্ছে একটি রামায়ত বৈষ্ণবের মুখে উনি একটি সুর শুনেছিলেন। ঐ সুরটি তাঁর রচিত গানে লাগিয়েছিলেন। বৈষ্ণব গেয়ে যাচ্ছিল ভক্ত কবি তুলসীদাসের রচিত গান 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।' সেই রঘুপতি, রঘুবীরকে দর্শন করে এসেছেন ইনি (বুদ্ধিরাম)। ধন্য ইনি! গান না, আপনারা এই গানটি — এই বলিয়া নিজেই ধরিলেন। ভক্তগণও যোগদান করিলেন। ধুম লাগিয়াছে। মত্ত হইয়া সকলে গাহিতেছেন।

গান। সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ দুস্‌রা ন কোই॥ ইত্যাদি।

রাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ।
১৪ই পৌষ, ১৩৩১ সাল, সোমবার। শুক্লা চতুর্থী ৪৭ দণ্ড ৫৮ পল।

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

যোগসূত্র সাধু ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতির্ময় কামারপুকুর ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছেন স্বামীজী ২৬

চতুর্থ অধ্যায়

জীবন্মুক্তি বিদেহমুক্তির দৃষ্টান্ত ঠাকুর ৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধবিহার, চার্চ ও ব্রাহ্মসমাজে শ্রীম ৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

কি গো, আমি নাকি অনেক নেমে গেছি ৫৯

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম মানে বিশ্বাস ৬৯

অষ্টম অধ্যায়

কর্তাগিরির অভাব মানে মা ৭৮

নবম অধ্যায়

শ্রীম ও রাজর্ষি মনীন্দ্র নন্দী — বুদ্ধবিহারে ৮৬

দশম অধ্যায়

বেগুনওয়ালার হাতে হীরা ৯৫

একাদশ অধ্যায়

ভিক্ষা ও ব্রহ্মচারী ১০২

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তম বৈদ্য শ্রীম ১১১

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আজ মঠে মা জীবন্ত — শ্রীম ও ম্যাকলাউড ১১৯
চতুর্দশ অধ্যায়
তাঁর দর্শনে অতিমানব ১৩২
পঞ্চদশ অধ্যায়
আনন্দের সন্ধানে রঘু ১৪৩
ষোড়শ অধ্যায়
যেন জলে-ভাসা চাঁদ ১৫২
সপ্তদশ অধ্যায়
আজ বাবু নিজে এসেছেন ১৫৭

* * *

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(একাদশ ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রীশ্রী ঝুলন পূর্ণিমা
২০শে শ্রাবণ, ১৪১৬
(৫ই অগাষ্ট, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬/৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(একাদশ ভাগ)

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

১১

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রীম - দর্শন

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)